দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

উন্নয়ন ও পরিবেশকে একসঙ্গে রেখেই হোক পরিবেশ আন্দোলন
পৃঃ - ১৩

ইমানদারির রমজান মাসে পাকিস্তানের বেইমানি
পৃঃ - ২৪

৭০ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।। ৪ জুন ২০১৮।। ২০ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

দূষণমুক্ত পরিবেশ ছাড়া সুস্থ জীবন সম্ভব নয়

রমজান মাসে সংঘর্ষ বিরতি সক্রিয় হবে জিহাদিরা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৪ জুন - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের কলমবাজদের থেকে দূরে থাকুন ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

খোলা চিঠি : পিসি দিলেন লজ্জা, ভাইপো পড়লেন লজ্জায় ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

ডিজিটাল ভারতের স্বপ্ন সাফল্যের দোরগোড়ায় ▯ রবিশঙ্কর প্রসাদ ▯ ৮

কোটি কোটি হিন্দুর ভাবাবেগের কোনও মূল্য এই 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশে নেই ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

উন্নয়ন ও পরিবেশকে একসঙ্গে রেখেই হোক পরিবেশ আন্দোলন ▯ মোহিত রায় ▯ ১৩

জ্ঞানপাপীদের পরিবেশচিন্তা ও পূর্ব কলকাতার জলাভূমি ▯ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৫

ইতিহাসের ধারা ▯ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৭

রমজান মাসে কাশ্মীরে সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণায় জিহাদিরা সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে ▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ২৩

ইমানদারির রমজান মাসে পাকিস্তানের বেইমানি ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৪

ভ্রমণ : নেভা থেকে মস্কোভা ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২৬

ভারতবর্ষই গণিত শাস্ত্রের সূতিকাগৃহ ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩১

শ্রবণবেলগোলা গোমতেশ্বর ▯ সৌমেন নিয়োগী ▯ ৩২

আমের তুমি, আমের আমি, নাম দিয়ে যায় চেনা ▯ স্বপন দাস ▯ ৩৩

গল্প : চোর ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩৫

সন্ত্রাসবাদের উৎসমূলে আঘাত করতে প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস ▯ সন্তোষ দেবনাথ ▯ ৪৩

রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা বিস্ময়কর ▯ গোপীনাথ দে ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **এইসময়, সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪১** ▯ **রাশিফল : ৫০**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

চার বছরে ভারতের সড়ক ও পরিবহণ দপ্তরের সাফল্য

গত চার বছরে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার বহু বিষয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। সরকারের সাফল্যের তালিকায় একেবারে প্রথম দিকে রয়েছে সড়ক ও পরিবহণ দপ্তরের নাম। বিভাগীয় মন্ত্রী নীতীন গড়করি সড়ক ও সেতু নির্মাণে এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা দীর্ঘকাল ভারতের মানুষ মনে রাখবেন। জাহাজ নির্মাণ ও জলপথ পরিবহণেও উন্নতি হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় দ্বিতীয় এন ডি এ জমানায় সড়ক, পরিবহন এবং জাহাজ শিল্পের উন্নতি।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মোদী সরকারের চতুর্থ বর্ষ পূর্তি

মোদী সরকারের চতুর্থবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ক্ষমতাসীন দল যখন সরকারের সাফল্যগুলি তুলিয়া ধরিতেছে, সেই সময় বিরোধী দলগুলি সরকার সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিতেছে। সরকার বিরোধী ভূমিকায় কংগ্রেস অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং এই বিরোধিতা এতটাই যে মোদী সরকারের চতুর্থবর্ষ পূর্তির দিনটিকে 'বিশ্বাসঘাতক দিবস' বলিয়া পালন করিয়াছে। ইহা ঠিক যে কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলগুলির এইভাবে বিরোধিতা করিবার অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁহারা এই দাবি করিতে পারে না যে মোদী সরকার গত চার বছরে কিছুই করে নাই এবং এই কারণে দেশ সংকটের মুখোমুখি হইয়াছে। বরং মোদী সরকারের চতুর্থবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে টাইমস গ্রুপ আয়োজিত এক অনলাইন সমীক্ষার রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, শুধু মোদী ক্যারিশমাই নয়, তাঁহার সরকারের পারফরম্যান্সেও দারুণ খুশি অধিকাংশ দেশবাসী। এই সমীক্ষা অনুযায়ী আজও প্রধানমন্ত্রী পদে পছন্দের প্রার্থী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর ধারেকাছেও নাই কোনও নেতা। এমনকী কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী পদে পছন্দের প্রার্থী হিসাবে এই তালিকায় রহিয়াছেন অনেক নীচে—১১.৯৩ শতাংশে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার জন্য বর্তমানে দেশের ২০টি রাজ্যে ক্ষমতাসীন রহিয়াছে বিজেপি। বিরোধীরা বিভ্রান্ত, দেশের সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করিতেছেন যে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থেই মোদী সরকারের মতোই একটি স্থায়ী সরকার প্রয়োজন। বস্তুত 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এর মতো কোনও কঠিন পদক্ষেপ এবং সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে 'ওয়ান ম্যান ওয়ান পেনশন' নীতি বাস্তবায়িত করা একটি স্থায়ী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের পক্ষেই সম্ভব। মোদী সরকার তাহা করিয়া দেখাইয়াছেন।

গত চার বছরে দেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। দুর্নীতি লইয়া মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কেহ অঙ্গুলি উঠাইতে পারে নাই। সরকারের কড়া নজরদারিতে আমলাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিয়াছেন দুর্নীতি করিলে খেসারত দিতে হইবে। গত চার বছরে বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা-সহ আমলা দুর্নীতির দায়ে জেলে পর্যন্ত গিয়াছেন। বর্তমানে দেশে কালো ধনের জমানা অনেকটাই সঙ্কুচিত হইয়াছে, পরিবর্তে স্থান লইয়াছে জনধন যোজনা। অর্থাৎ জনতার সম্পদ দিন দিন বাড়িতেছে। এই জনধন যোজনা-সহ গত চার বছরে মোদী সরকারের সাফল্যের তালিকায় রহিয়াছে জিএসটি ('এক দেশ এক কর' নীতি) রূপায়ণ, বিমুদ্রীকরণ, উজ্জ্বলা যোজনা। সামাজিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে উজ্জ্বলা যোজনা। গত ছয় দশকে দেশের ১৩ কোটি পরিবার এলপিজি সংযোগ পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে গত চার বৎসরে আরও ১০ কোটি নতুন এলপিজি সংযোগ করা হইয়াছে। শুধু গ্রামাঞ্চলেই ৪ কোটি মহিলার হাতে এলপিজি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিরোধী দলগুলি মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যতই অসহিষ্ণুতার, সাম্প্রদায়িকতার, ঘৃণার রাজনীতি করিতেছে বলিয়া অভিযোগ করুক না কেন, প্রাপ্ত তথ্য-পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলিতেছে। দেশের অধিকাংশ জনগণই বর্তমান সরকারের শাসনে সংখ্যালঘুরা 'নিরাপদ' বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই সঙ্গে মোদী সরকারের বিদেশনীতিকেও প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করেন অধিকাংশে ভোটার। সন্ত্রাস প্রশ্নে পাকিস্তানকে একঘরে করিতে সক্ষম হইয়াছে ভারত। বিশ্বের ১৯২টি দেশের মধ্যে ১৮৬টি দেশে কোনও না কোনও মন্ত্রী গিয়াছেন যাহা ভারতের 'বসুধৈব কটুম্বকম্' নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে ব্যর্থতা যে নাই এমন বলা যায় না। যেমন পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে না পারা, পেট্রল-ডিজেলের ক্রমবর্ধমান দামকে নিয়ন্ত্রণ করিতে ব্যর্থ হওয়া। এই রকম কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য না পাইলেও দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভোটার মনে করেন ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও মোদী সরকার পুনরায় ক্ষমতা দখল করিবে। দেশের মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাই মোদী সরকারের চতুর্থ বর্ষপূর্তির সাফল্যের সূচক।

সুভাষিতম্

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখং।

এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ।। (চাণক্যনীতি)

সমস্ত রকম পরাধীনতাই দুঃখের কারণ এবং সমস্তরকম আত্মসংযমই সুখের কারণ। এটাই সুখ-দুঃখের কারণ বলে জানবে।

একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের কলমবাজদের থেকে দূরে থাকুন

গত ২৬ মে কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকারের চার বছর পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ওই দিন বহুল প্রচারিত এক পত্রিকার চারের পাতায় সর্বজ্ঞ পণ্ডিত প্রবন্ধ লেখক অমিতাভ গুপ্ত মশাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মিথ্যুক প্রতারক আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, 'ভারতের মানুষ প্রশ্ন করেন না জানতে চান না। তাই প্রধানমন্ত্রী বিগত চার বছরে কোনও উন্নয়ন না করে স্রেফ প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন।' অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। সবই অসত্য অথবা অর্ধসত্য। বলেছেন, মোদীজীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' মুখ থুবড়ে পড়েছে। শিল্পপতিরা সাড়া দেননি। কালো টাকা বিদেশের ব্যাঙ্ক থেকে দেশে ফেরেনি। কৃষকের আয় বৃদ্ধি হয়নি...ইত্যাদি। অর্থাৎ, মোদীজী ব্যর্থ। তাঁর দল ও সরকারকে ক্ষমতা থেকে হঠাও।

এই ছদ্ম বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকদের নিয়ে বিপদ হচ্ছে যে খবরের কাগজের পরিচালকরা সামান্য কিছু টাকা দিয়ে যা খুশি লিখিয়ে নিতে পারেন। কারণ, তাঁরা জানেন যে ৯০ শতাংশ পাঠক প্রবন্ধের তথ্য সঠিক না বেঠিক তা নিয়ে মাথা ঘামান না। বরং যে সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি তাঁরা পাচ্ছেন সেগুলি রাজ্য সরকারের সৌজন্যে পাচ্ছেন বলেই মনে করেন। যেমন, এই কলকাতা শহরের পথঘাট, আলো, উড়ালপুল ইত্যাদি সবই হয়েছে কেন্দ্রের স্মার্ট সিটি প্রকল্পের টাকায়। দেশের প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চার বছরে কেন্দ্র সাতটি আই আই টি এবং সাতটি আই আই এম তৈরি করেছে। দরিদ্র মানুষের জন্য 'জন ধন' এবং 'জন সুরক্ষা' প্রকল্প গড়া হয়েছে। তাঁরা আধার কার্ড দেখিয়ে শূন্য ব্যালেন্স সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছেন। জন সুরক্ষা প্রকল্পে গরিব মানুষ পাচ্ছেন বিমা সুরক্ষা। দেশের সমস্ত গ্রামেই এখন বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। 'স্বচ্ছ ভারত' প্রকল্পে সাড়ে সাত কোটি গ্রামের বাড়িতে এখন শৌচালয় হয়েছে কেন্দ্রের অর্থ সাহায্যে। প্রধানমন্ত্রী অবাস যোজনায় ১ কোটি গরিব পরিবার পাকা বাড়ি পেয়েছেন। হ্যাঁ, মাত্র চার বছরের স্বল্প সময়ে। আমাদের বাঙালি

গূঢ় পুরুষের কলম

কলমজীবীরা শুধুই শহরের কথা বলেন। লালুপ্রসাদ যাদব যখন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল গ্রামের রাস্তার এতটা বেহাল অবস্থা কেন? তিনি বলেছিলেন গ্রামের মানুষজন মারুতি গাড়ি চড়ে না। তারা পায়ে হেঁটে অথবা গোরুর গাড়ি চড়ে যায়। তাই তাদের পাকা সড়কের প্রয়োজন নেই। এই হচ্ছে গরিবের মসিহাদের চরিত্র। এইসব চরিত্রদের নিয়ে মমতা ফেডারেল ফ্রন্ট গঠনের আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখছেন।

মোদীজী বিগত চার বছরে মানুষের জন্য কী কী কাজ করেছেন তার তালিকা দীর্ঘ। স্বল্প পরিসরে তার পূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের কথা এখানে বলছি। আমাদের দেশে মহিলা ও শিশুকন্যারা সবচেয়ে অবহেলিত। আজও কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য পরিবারে মাকে লাঞ্ছিতা হতে হয়। শিশু কন্যাকে ধর্ষিতা হতে হয়। সঙ্ঘের প্রচারক থাকাকালে মোদীজী নিজে নারীর প্রতি সমাজের অবহেলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ক্ষমতায় আসার পর তিনি মা ও শিশুকন্যার সুরক্ষার জন্য দেশজুড়ে 'সুকন্যা সমৃদ্ধি' যোজনা চালু করেন। শিশু কন্যাদের জন্য কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এইসব অ্যাকাউন্টে গত চার বছরে ২০,০০০ কোটি টাকা জমা পড়েছে। এই অর্থ শিশু কন্যার শিক্ষার জন্য মা ব্যবহার করতে পারবেন। শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করলে ধর্ষককে মৃত্যু দণ্ড দেওয়ার আইন লাগু হয়েছে। তিন কোটি আশি লক্ষ দরিদ্র পরিবারের মাকে বিনা মূল্যে বা স্বল্প মূল্যে রান্নার এল পি জি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। তবে এতে প্রধানমন্ত্রী খুশি নন। তিনি বলেছেন কমপক্ষে আট কোটি দরিদ্র মাতাকে বিনা মূল্যে রান্নার গ্যাস দিতে হবে। 'আয়ুষ্মান ভারত' বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প। ৫০ কোটি গ্রাম এর সুফল পাবে।

ওই পত্রিকার ২৬ মে (শনিবার) সংস্করণটির প্রথম পাতায় বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে আচার্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীক্ষান্ত ভাষণটিকে বিদ্রূপ করে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'এটা কি নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চ?' বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে, 'এরা 'আচার্যের শিষ্য'। বেদগানের সময় সিটি দিচ্ছে। পড়ুয়ারা স্লোগান দিচ্ছে, মোদী মোদী, ভারতমাতা কী জয়, জয় শ্রীরাম। লজ্জায় মাথা হেঁট বহু প্রবীণ শিক্ষক এবং আশ্রমিকদের।' কী আশ্চর্য! কলকাতার অন্য বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন না কেন? টাইমস অব ইন্ডিয়ার বাংলা সংস্করণ কাগজের সাংবাদিক লিখেছেন, ''ভাষণের শুরুতেই বাংলায় মোদীকে বলতে শোনা যায় শান্তির নীড় কবিগুরুর স্মৃতি শান্তিনিকেতনে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও শান্তি অনুভব করছি। ভাষণ যতই গড়িয়েছে ততই উঠেছে হাততালির ঝড়।'' ওই বাজারি পত্রিকার চরিত্র বুঝতে এটুকুই যথেষ্ট। ■

পিসি দিলেন লজ্জা, ভাইপো পড়লেন লজ্জায়

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুপ্রিমো, তৃণমূল কংগ্রেস
দিদি,

আমি সভাগৃহে ছিলাম। দেখলাম দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর পাশে আপনি বসে রয়েছেন। হেব্বি লাগছিল। আমি জানি যে, দেশে-বিদেশে অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আপনি বসেন, কথা বলেন। একই মঞ্চে বক্তৃতা দেন। কিন্তু সাদা চোখে দেখিনি।

সেদিন দেখলাম। শান্তিনিকেতনে আপনি ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে। আমি দর্শকের আসনে। সামনে নয়, ভিআইপিদের ঠিক পিছনে আমি বসেছিলাম। অন্ধকারে মনে হয় দেখতে পাননি। দেখতে পেলে আপনার কষ্ট হতো।

হলে তখন বাংলাদেশের হাফ ডজন মন্ত্রী। গায়ক, কবি, শিল্পী, খেলোয়াড় কে না এসেছেন। আর অসংখ্য রবীন্দ্রপ্রেমী ও গবেষক। বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা গাইলেন দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত। একই মানুষের লেখা। আর সেই মানুষটাকে কেন্দ্র করেই এই মিলন। আর সেই মিলন অনুষ্ঠানে 'আমার দিদি' বক্তা। গর্ব হবে না বলুন। খুব হচ্ছিল।

আপনি যখন বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন আমার মুখ তখন চকচক করছে। কিন্তু তা-র-প-র...

এ কী করলেন দিদি। বললেন, আপনার দারুণ লাগছে। সত্যিই তো আপনার দারুণ লাগারই কথা। কিন্তু তার পরেই আপনি আপনার দারুণ লাগার উদাহরণ দিতে গিয়ে বললেন— 'দারুণ অগ্নিবাণে রে'।

কেন বললেন দিদি? হল জুড়ে গুঞ্জন। বাংলাদেশের অতিথিরা খুকখুক হাসছেন। আর ঠিক তখনই আমার মুখটা লজ্জায় নীচু হয়ে গেল। কালো হয়ে গেল। আমার খালি মনে হচ্ছে শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন, আমি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার বাসিন্দা। আমার বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বাংলা ব্যবহার, রবীন্দ্র ব্যবহার কেন এমন হবে।

তৃণমূল কংগ্রেসে দিদি এমন হয়ই। তাজা ছেলে আরাবুলের দলের নেত্রী হিসেবে এসব অবশ্য আপনি বলতেই পারেন। কিন্তু আপনি মুখ্যমন্ত্রী বলেই বাংলার বাসিন্দা হিসেবে বড্ড চাপ।

আমি কিন্তু এটায় অবাক হইনি যে, সারদা-কাণ্ডে মদন মিত্রের দিকে আঙুল তুলে দিলেন খোদ ভাইপো। তিনি সারদার দু' হাজার কোটি টাকা 'মেরেছেন', এমন কথা বেরিয়ে এল সাংসদ ও যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ থেকে।

গত শুক্রবার যখন আপনি মোদী-হাসিনার সভায় 'দারুণ অগ্নিবাণ' ছড়াচ্ছেন, ঠিক তখনই পার্কস্ট্রিট মোড়ে বক্তৃতার সময়ে অভিষেক বলেন, ''সারদা সারদা করে যাঁরা গলা ফাটিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন, মানুষের দু' হাজার কোটি টাকা মেরে মদন মিত্রের মতো একজন নেতাকে তিন বছর জেলে থাকতে হয়েছে। অথচ এক দিকে বিজয় মাল্য ১০ হাজার কোটি টাকা নিয়ে অন্যদিকে, ১৪ হাজার কোটি টাকা নিয়ে নীরব মোদী ভারত থেকে পালিয়ে গেলেন। ২৪ হাজার কোটি টাকা মারার জন্য বিজেপি নেতাদের জেলে ঢোকানো হবে না কেন, মানুষের মনে এ প্রশ্ন উঠছে।''

প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপিকে বিঁধতে গিয়ে অভিষেক যে ভাবে মদনবাবুর নাম টানলেন, তা কি কার্যত মদনবাবুকেই বিঁধছে না? এ নিয়ে একটি কথাও বলতে চাননি মদন। আর তৃণমূলের একাংশের ব্যাখ্যা, ওটা 'বলার ভুল'।

সবটা হজম করে জেলখাটা মদন বলেছেন, ''অভিষেক দলের প্রধান সেনাপতি। নেত্রীর নেতা হিসেবে অভিষেকের অভিষেক হয়ে গিয়েছে। ও আমার পরিবারের একজন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক, লতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা যদি পাশে না থাকতেন তাহলে কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিটিং করতে পারতাম?''

পরে মদন আরও বলেন যে, তিনি মনে করেন অভিষেক বলতে চেয়েছিলেন, তাঁকে মিথ্যে অভিযোগে আটক রাখলে নীরব মোদীরা বাইরে কেন? যেহেতু সারদা চিটফাণ্ড মামলাটি বিচারাধীন তাই এ নিয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না বলেও জানান মদন। আদালত যা রায় দেবে তাই মেনে নেবেন বলেও জানান মদন।

নিজের জনসমর্থনের ভিত্তি নিয়ে দাবি করতে গিয়েই মদন বলেন, ''আমি চ্যালেঞ্জ করছি, কামারহাটি থেকে দল যদি আমাকে মনোনয়ন দেয় তাহলে আমি ৫০ হাজারের বেশি ভোটে জিতব। যদি না পারি তাহলে মাথা মুড়িয়ে তিরুপতিতে দিয়ে আসব।''

এই চ্যালেঞ্জটা আবার কাকে দিলেন মদন মিত্র? সত্যি কী বিচিত্র এই তৃণমূল। একেবারে যেন-দারুণ অগ্নিবাণে রে...

—সুন্দর মৌলিক

ডিজিটাল ভারতের স্বপ্ন সাফল্যের দোরগোড়ায়

অতিথি কলম

রবিশঙ্কর প্রসাদ

ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যে দিক দর্শন ঠিক করেছিলেন, যার ফলে ভারতে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার এই বড় কাঠামোরই অন্তর্গত ও সহায়ক ছিল স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া ও স্কিল ইন্ডিয়া।

সরকারের চার বছর পার হয়ে যাওয়ার পর বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বাস্তবায়নের ফলে নাগরিকদের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন চাকরিও তৈরি হচ্ছে। একই সঙ্গে ব্যবসার উদ্যোগীর সংখ্যাও বেড়েছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ২,৭৪,২৪৬ কিলোমিটার অপটিকাল ফাইবারের মাধ্যমে যোগাযোগ 'ভারত নেট'-এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। ১.১৫ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সংযুক্তিকরণ ঘটেছে। বিগত সরকারের মাত্র ৩৫৮ কিলোমিটার সম্প্রসারণের পাশাপাশি এই বৃদ্ধিই প্রমাণ করে কী গতিতে আমরা দেশে ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরি করেছি।

আজকের আধার যার পেছনে রয়েছে একটি শক্তপোক্ত আইনি রক্ষাকবচ। এখন কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সংখ্যার মাধ্যমে সরাসরি তার প্রাপ্য 'ন্যূনতম সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বচ্ছতায়' মসৃণভাবে নির্দিষ্ট খাতায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যা পূর্বতন সরকারের আমলে সম্ভব ছিল না। শস্য বিক্রয়ের মাণ্ডিগুলিকে ই-ন্যাম (national Agricultural marketing)-এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ছাড়াও আরও বহু জিনিসকে ডিজিট্যাল পদ্ধতির আওতায় আনার ফলে নিখুঁতভাবে দেওয়া-নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে নতুন উদ্যোগপতির সংখ্যাও বাড়ছে। শুধুমাত্র ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রেই অভাবনীয় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশে তৈরি ভীম অ্যাপ-এর মাধ্যমে লেনদেনের অঙ্ক অক্টোবর ১৭ সালে ছিল ৫৩২৫ কোটি টাকা যা মার্চ ২০১৮ সালে ২৪১৭২ কোটি টাকায় ছুঁয়েছে। এই ধরনের নজিরবিহীন বাড়বৃদ্ধি এক চূড়ান্ত বদলেরই ইঙ্গিত বহন করে যার পরিণতিতে উদ্যোগ ও চাকরির সুযোগ দুটিই নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পায়। অতি সম্প্রতি চালু হওয়া 'উমঙ্গ' অ্যাপ যার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরিষেবাগুলিকে একটি Platform-এর মাধ্যমে সংহত করা হয়েছে। সেই অ্যাপ ২০১৭ সালের নভেম্বরে চালু হওয়ার পর থেকে ৫০ লক্ষ ডাউনলোড হয়েছে।

এই ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সংকল্পকে একটি গণআন্দোলনের চেহারা দিতে দেশের ছোট ছোট শহরে বিপিও খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় সরকারি অর্থনৈতিক মদত অবশ্যই দেওয়া হচ্ছে। মাত্র তিন বছরের মধ্যে দেশের ২৭টি শহর ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ৮৯টি বিপিও চালু হয়ে গেছে। বর্তমানে ইম্ফল, গুয়াহাটি, শিলিগুড়ি, পাটনা, মজফ্ফরপুর, মাদুরাই, পুদুচেরী শুধু নয়; সুদূর বাদগাম, শোপর বা শ্রীনগরের মতো বিক্ষুব্ধ জায়গাতেও এগুলি সক্রিয়। স্থানীয় বহু ছেলে- মেয়ে ছাড়া গ্রামীণ অঞ্চল থেকে এসেও অনেকে সেখানে চাকরি করছে। এমনকী অনেকে বিদেশ থেকেও গ্রাহককে পরিষেবা দিচ্ছে। হাজার হাজার চাকরির মুখ খুলে দিয়েছে এই উদ্যোগ। এই সূত্রে যে জেএম ত্রয়ী (অর্থাৎ ৩১ কোটি 'জনধন' ব্যাঙ্ক খাতা, ১২০ কোটি আধার ও ১২১ কোটি মোবাইল ফোন) সৃষ্টি হয়েছে তা অভাবনীয়। জনগণের কল্যাণকর প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রাপ্য অর্থ গরিবদের খাতায় ডিবিটি (Disect Bank Transfer) হওয়ায় সরকারের কোষাগারে ৯০ হাজার কোটি টাকা বেঁচেছে। এরই একটিই মাত্র কারণ ডিজিটাল আইডেন্টটিটি অর্থাৎ সাংখ্যিক পরিচয় তৈরি হওয়ার ফলে দালাল ও ভুয়ো গ্রাহক ধরা পড়ে গেছে।

সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র (Common Service Centre) গ্রামে যেগুলি এই সরকার আসার সময় ছিল মাত্র ৮৩ হাজার আজ তার সংখ্যা ২ লক্ষ ৯১ হাজার। এই সিএসসি ১ লক্ষ ৮২ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতে সক্রিয়। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং থেকে বিমা, পেনসন থেকে জমির রেকর্ড, বিল পেমেন্ট সবই ডিজিটাল পরিষেবার মাধ্যমে সফলভাবে হচ্ছে। এদের মধ্যে আবার দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টিও (Skill development) ঢুকছে। এলইডি বাল্ব উৎপাদন, ডিজিটাল সচেতনতা ও নিজেকে ডিজিটাল ক্ষেত্রে শিক্ষিত করে তোলার কাজ নিরন্তর চলেছে। খুব কম খরচে মেয়েদের ঋতুকালীন ন্যাপকিন তৈরির মাধ্যমে গ্রাম ভারতে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোয় স্কিল ইন্ডিয়া সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে। ২০১৭-১৮ সালের অর্থবর্ষে সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৯৯২৫ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে যা আগের জমানায় ২০১৩-১৪ সালে ছিল মাত্র ১৮২ কোটি টাকা।

দেশে তৈরি, কম খরচের প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগ যেমন ই-হসপিটাল, ই-স্কলারশিপ, জমির উর্বরতা সংক্রান্ত

কার্ড দেওয়া, প্রবীণদের জন্য জীবন প্রণাম, চাষিদের ডিজিটাল ইকো সিস্টেমে এই অভূতপূর্ব উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে দেশের চিরাচরিত বৃহৎ আই টি ক্ষেত্র। ন্যাসকম-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী আই টি-বিপিএম এই যৌথ ক্ষেত্র বর্তমানে ব্যবসার পরিমাণ ১৬৭ বিলিয়ন ডলার যার মধ্যে রপ্তানির অংশ ১২৬ বিলিয়ন। এই ক্ষেত্রে বিগত তিন বছরে ৬০ লক্ষ নতুন চাকরি হয়েছে। এর মধ্যে ৩৯৭ মিলিয়ন সরাসরি নিযুক্ত হয়েছে, ১২ মিলিয়ন অনুসারী ক্ষেত্রে কাজ পেয়েছে। বিশ্ব জোড়া মন্দার মুখেও ভারতে এই ক্ষেত্রটি বৃদ্ধি পেয়েছে ও ২০১৭-১৮ সালে এখানে ১ লক্ষ চাকরি হয়েছে।

মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের বৃহত্তর অংশ হিসেবে আমার দপ্তর বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির উৎপাদনে টানা মদত দিয়েছে। এম এস আই পি এস-এর প্রকল্পের সরকারি উদ্যোগ সহায়তার সুবাদে বিগত চার বছরে বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে দেশে ২টি মাত্র মোবাইল তৈরির কেন্দ্র ছিল। সেই সংখ্যা ২০১৮ সালে ১২০টি। এই একই হিসাববর্ষে মোবাইল হ্যান্ডসেটের উৎপাদন ৬ কোটি থেকে বেড়ে সাড়ে ২২ কোটি হয়েছে। টাকার অঙ্কে ১৮৯০০ কোটি থেকে ১ লক্ষ ৩২ হাজার কোটি টাকা। এই উৎপাদন শিল্পে ১ লক্ষ সরাসরি চাকরি ও ৩ লক্ষ অনুসারি চাকরি হয়েছে। একইভাবে টিভি ও এলইডি বাল্বের উৎপাদনও বিগত চার বছরে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে— ৫০টি নতুন ইউনিট স্থাপিত হয়েছে।

আরও একটি অত্যন্ত বড়সড় বৃদ্ধির ক্ষেত্র হলো ই-কমার্সের। প্রধানত গ্রামীণ ক্ষেত্রের বর্ধিত চাহিদাকে ভিত্তি করে ই-কর্মার্সের বৃদ্ধি। সরাসরি চাকরি দেওয়া ছাড়াও এরই সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বা এর প্রভাব পড়ছে micro, small, medium উদ্যোগগুলির ওপর (এমএসএমই)। পক্ষান্তরে, এই এমএসএমই আবার নিজেরাই চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করছে। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে গ্রামীণ মহিলা পুরুষ সমবায় ভিত্তিতে অত্যন্ত সফলভাবে এই উদ্যোগ চালাচ্ছে।

অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সেই সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ অবশ্যই উজ্জ্বল, কেননা ভারত অনেকাংশেই আজ ডিজিটাল অর্থনীতি। বাজার তথা চাহিদা বিপুল, জনসংখ্যার মধ্যে বিচিত্র দ্রব্যের চাহিদা ও দক্ষ কর্মীর অভাব নেই, নাগরিকদের মধ্যে প্রযুক্তি আয়ত্ত করে নেওয়ার আগ্রহ অপরিসীম।

ডিজিটাল অর্থনীতির প্রথা প্রকরণ নিয়ে আমরা যখন চর্চা করে তাকে দেশের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করছি তখন সকলেই কিন্তু স্বীকার করে নিচ্ছে (যাঁরা অর্থনীতির জগতের সঙ্গে যুক্ত) যে ভারত অচিরেই ১ ট্রিলয়ন ডলারের বিশাল অর্থনীতি হয়ে ওঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে (বর্তমান স্থান ইউএসএ, জাপান, চায়না, জার্মানির পরেই পঞ্চম।) এই চূড়া স্পর্শ করতে আরও ৫ থেকে ৭ বছর লাগবে। এই উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় চাকরি হবে ৫০ থেকে ৭০ লক্ষ মানুষের।

সম্প্রতি একটি বড় প্রযুক্তি কোম্পানির এশিয়া হেড-এর সঙ্গে কথায় কথায় তিনি আমাকে জানালেন--- আই আই টি ক্যাম্পাসে নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নিতে গেলে ভালো ভালো ছেলে-মেয়েরা চাকরিতে যাওয়া পছন্দ করছে না। তারা স্টার্ট আপ তৈরির পথে যেতে চায়, যেখানে তারা নিজেরাই চাকরি দিতে পারবে। তাই একথা নির্দ্বিধায় অবশ্যই বলা যায় যে, ভারতে ডিজিটাল এমপ্লয়মেন্ট, এনটারপ্রিনারশিপ, এমপ্লয়মেন্ট-এর তিনটিরই বাস্তবায়িত হওয়ার সময় এসে গেছে।

(লেখক কেন্দ্রীয় সরকারের আইন ও বিচার এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী)

“
অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সেই সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ অবশ্যই উজ্জ্বল, কেননা ভারত অনেকাংশেই আজ ডিজিটাল অর্থনীতি। বাজার তথা চাহিদা বিপুল, জনসংখ্যার মধ্যে বিচিত্র দ্রব্যের চাহিদা ও দক্ষ কর্মীর অভাব নেই, নাগরিকদের মধ্যে প্রযুক্তি আয়ত্ত করে নেওয়ার আগ্রহ অপরিসীম।
”

রম্যরচনা

বাংলায় অতি উত্তম এক বিবাহ অনুষ্ঠানের মেনুকার্ড

- প্রবেশিকা—তিন্তিরা রসসিক্ত মোহিনী গর্ভিনী গোলক ও সুশীতল বর্ণালী পানীয় (FUCHKA & COLD DRINKS)।
- প্রধান খাদ্য—
- কোমল ঘৃতাপ্লুত গোধূমচূর্ণের পত্রগোলক (LUCHI)।
- তৈজস কষায়িত চণক (CHHOLAR DAAL)।
- তক্রসিক্ত পনির (DOI PANEER)।
- পলান্ন (BIRIYANI)।
- কুক্কটের মসৃণ অগ্নিময় শলাকা (TANDOORI CHICKEN)।
- রম্ভা পত্রাবৃত তৈজসময় মৎস্য (MAACHHER PATURI)।
- আদ্রক মরিচ কষায়িত কোমল অজমাস (KOSHA MANGSHO)।
- অম্লমধুর অমৃতফলক (AAMER CHATNI)।
- পর্পট (PAPOD)।
- হিমায়িত দুগ্ধাগ্র (ICE CREAM)।
- ঈষদুত্তপ্ত গোলাপাভ রসগোলক (GOLAPJAM)।
- ধূমায়িত শর্করা মিশ্রিত ছিন্নকমণ্ড (JILAPI)।
- বিশ্বনাথ ধামের তাম্বুল (PAAN)।

-আরে পাগলা খাবি কী?

-নাম শুনেই মরে যাবি।।

উবাচ

"সীমান্তে একদিকে যখন জওয়ান ও নিরীহ মানুষের ওপর পাকসেনা আক্রমণ চালাচ্ছে, তখন শান্তিপূর্ণ আলোচনা কখনই সম্ভব নয়।"

পাকিস্তানের ক্রমাগত সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন প্রসঙ্গে

সুষমা স্বরাজ
কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী

"যখন থেকে উজ্জ্বলা যোজনায় দেশবাসী সুবিধা পেতে শুরু করেছে, তখন থেকে এক বিশাল সামাজিক পরিবর্তন চোখে পড়ছে।"

উজ্জ্বলা যোজনায় সুবিধাভোগীদের নিয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছি ঠিকই, কিন্তু রাজ্যের মানুষ আমাকে পুরোপুরি সমর্থন দেয়নি।"

সাংবাদিকদের সামনে নিজের অবস্থা সম্পর্কে

এইচ ডি কুমারস্বামী
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী

"পাঁচদিন ফেসবুক বন্ধ রাখুন, অনেক কমবে মানসিক চাপ।"

তাঁর 'জার্নাল অব সোশ্যাল সাইকোলজি'র গবেষণাপত্রে

ড. এরিক ভ্যানম্যান
কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক

"এরা যখন যেমন তখন তেমন। এদের রাজনৈতিক ট্র্যাক রেকর্ডে স্থায়িত্ব বা সুস্থিরতা বলে কিছু নেই।"

টিএমসি ডিএমকে ইত্যাদি দলের রাজনৈতিক খামখেয়ালিপনা প্রসঙ্গে

অরুণ জেটলি
বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা

কোটি কোটি হিন্দুর ভাবাবেগের কোনও মূল্য এই 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশে নেই

ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

কিছুকাল আগে ড. রতন ভট্টাচার্য একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে জানিয়েছেন, 'বাবরি মন্দির ধ্বংসের পর তাজমহলও মৌলবাদীদের শিকার হয়েছে।'

আমাদের স্ব-ঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দুটো গুণ লক্ষ্য করার মতো। প্রথমত, তাঁরা পড়েন কম, আর দ্বিতীয়ত, যদি সত্য এবং তথ্য-যুক্তি ও প্রমাণ বিপরীতধর্মী হয়ও, তাঁরা তাঁদের ধারণা ও বিশ্বাস কিন্তু বদল করেন না। এক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে।

তাজমহলের কথা জানি না। কিন্তু বাবরি ধাঁচা নিয়ে আমাদের কিছু কথা বলার আছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাসের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ড. মাখনলাল রায় চৌধুরী লিখেছেন, 'বাবর অযোধ্যা বিজয়ের পর শ্রীরামচন্দ্রের বাসভূমি অযোধ্যার মন্দির ধ্বংস করেন এবং উহার উপর মসজিদ নির্মাণ করেন'— (ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯)। বরেণ্য ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেছেন— (২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭)।

কোনও কোনও ঐতিহাসিক অবশ্য মনে করেন, বাবর ধর্মান্ধ ছিলেন না, তাঁর মধ্যে যথেষ্ট সহনশীলতা ছিল। আর. পি. ত্রিপাঠীর মতে, তাঁর উদার ধর্মমত পরবর্তীকালে আকবরের সহনশীলতার ভিত রচনা করেছিল— (রাইজ অ্যান্ড ফল্ অব দ্য মুঘল এম্পায়ার)। অবশ্য এই মত ড. সৈয়দ মামুদ আদৌ মেনে নেননি— (দ্য ইন্ডিয়ান রিভিউ, আগস্ট, ১৯২৩, পৃ. ৪৯৮)।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কে. এস. লাল মনে করেন, বাবর কাজটা করিয়েছিলেন তাঁর অন্যতম সেনাপতি বাকির মাধ্যমে— 'In 1528-29, Mir. Baqui, a Mugal commander, by Babar's order, destroyed the temple of Ayodhya commemorating Lord Rama's birth place and built a mosque in its place— (মুসলিম স্টেট ইন্ ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৫৬)। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জাহান আয়েসা সিদ্দিকাও জানিয়েছেন— বাবরের আদেশে মির বাকি খাঁ রামমন্দির ধ্বংস করে তার ওপর মসজিদ তৈরি করিয়েছেন— (ইসলামি শান্তি ও বিধর্মী সংহার, পৃ. ২০)।

প্রগতিশীল সাজতে গিয়ে অনেকে হিন্দু-আঁতেলও ভিড়ে গিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁদের দলে আছেন কিছু নেতা-নেত্রী এবং মন্ত্রীও। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হলো ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। তাই তাঁরা কখনও গগনবিদারী আলোড়ন তোলেন, আবার কখনও মূক-বধির ও অন্ধ সেজে থাকেন।

তবে কাজটা সহজে হয়নি। এই নিয়ে নাকি ৭৭ বার যুদ্ধ হয়েছিল। নিচের অংশে এখনও রয়ে গিয়েছে রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের মূর্তি। যুদ্ধে হিন্দুরক্তে তখন সরযূর জল লাল হয়ে গিয়েছিল— (ক্রিস্টোফার জেফিলেট— ন্যাশানালিস্ট মুভমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, পৃ. ৪০২)।

তবে ভাঙাভাঙির এই রীতি ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আদৌ মানায় না। তাই আমরা চাই উদারতা ও সহনশীলতা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিখিয়েছেন—'যত মত তত পথ'। তিনি তিনদিন ইসলাম ভাবে এবং পনেরো দিন খ্রিস্ট আবেশে বিভোর হয়ে সাধনা করেছিলেন। এটা এসেছে আমাদের প্রাচীনকালের জীবনদর্শন থেকে।

ড. অসীম দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, তুর্কিদেশ থেকে যখন ইসলাম হিন্দু মন্দির ও মন্দিরের পুরোহিতদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখনই আমাদের ঐতিহ্যগত যুগের অবসান ঘটেছে। তার আগে যে এক অপূর্ব সহিষ্ণুতা ও উদারতা ছিল, সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে তার প্রমাণ রয়েছে— (বিষয় স্বাধীনতা এবং অন্যান্য বিষয়, পৃ. ১৪৬)।

আসলে, দুই সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিতে পাশাপাশি বাস করেছেন কয়েক শতাব্দী ধরে। অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদাবলী লিখেছেন, হিন্দুরা গিয়েছেন পির-দরবেশের মাজারে। পরে এসেছে খ্রিস্টান ও অন্যরা।

বিভেদ গড়ে তুলেছে ইংরেজ শাসকরাই। যখন ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেটা ছিল এক উদার, ঐক্যবদ্ধ ও জাতীয় সংস্থা— (ড. নিমাইসাধন বসু— দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল

মুভমেন্ট, পৃ. ২৯)। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই সরকার বিভেদের ক্লিন্ন ও হীন রাজনীতি তৈরি করেছে ধর্মকে টেনে এনে। অধ্যাপক ড. পি. এন. পেপ্‌রার মতে, 'the Morlay-Minto Act created a rift among the Hindus and Muslims– (ইন্ডিয়া'জ স্ট্রাগল্ ফর ফ্রিডম, পৃ. ২৪)। ইকবাল সৈয়দ আমেদ প্রমুখ ব্যক্তিরা চেয়েছেন পৃথক ও সংকীর্ণ অস্তিত্ব। কংগ্রেস চিহ্নিত হয়েছে নিছক এক হিন্দু প্রতিষ্ঠান হিসেবে। সৈয়দ আমেদ জানিয়েছেন, ব্রিটিশ শাসন শেষ হলে ভারতে কংগ্রেস রাজত্বে মুসলমানরা শোষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত হবে— (দে-ত্রিপাঠী-চন্দ্র—ফ্রিডম্ স্ট্রাগল্, পৃ. ৯০৬)।

সেই বিচ্ছিন্নতাবাদই দেশকে এক সময় দ্বিধাবিভক্ত করেছে। এই দেশে কয়েক কোটি মুসলমান রয়ে গেছেন, কিন্তু দুঃখের কথা— তাঁদের অনেকের মধ্যেই রয়েছে 'আইডেনটিটি ক্রাইসিস।' তাঁরা বৃহত্তর দেশীয় জনতার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি, তাঁরা ধর্মীয় গোঁড়ামি ত্যাগ করতে পারেননি। অবশ্যই তাঁরা রাষ্ট্রে বাস করেন কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের ঊর্ধ্বে রাখতে চান তাঁদের শরিয়তি আইনকে। ড. হরিহর নাথ লিখেছেন— ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ইরাক, ইরান ইত্যাদি দেশ শরিয়তকে অনেকটা আধুনিক করে তুলেছে বাস্তব কারণে, কিন্তু 'the vested interests among the Indian Muslims are guided by mediaevalism'--- (ইন্ডিয়া, ডেমোক্রাটিক গর্ভনমেন্ট, পৃ. ৪০৯)। অনুরূপভাবে, ড. জে. সি. জোহারি মন্তব্য করেছেন, এখনও তাদের মধ্যে অনেকে 'কন্‌জারভেটিভ ভিউ' নিয়ে চলেছেন— (ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, পৃ. ২৮২)।

দুঃখের বিষয়, প্রগতিশীল সাজতে গিয়ে অনেকে হিন্দু-আঁতেলও ভিড়ে গিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁদের দলে আছেন কিছু নেতা-নেত্রী এবং মন্ত্রীও। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হলো ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। তাই তাঁরা কখনও গগনবিদারী আলোড়ন তোলেন, আবার কখনও মূক-বধির ও অন্ধ সেজে থাকেন।

আফ্‌রাজুল ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। সঙ্গতভাবেই তাতে তাঁরা প্রবল শোরগোল তুলেছেন। অবশ্যই যে-কোনও হত্যা, আঘাত হানা বা আক্রমণ জঘন্য অপরাধ— তার জন্য কঠোরতম শাস্তিই দরকার। কিন্তু একইভাবে আরও কয়েকজনও ভিন রাজ্যে নিহত হয়েছেন। তখন তাঁরা আশ্চর্যজনক-ভাবে নীরবতা পালন করেছেন।

কয়েক হাজার হিন্দু পণ্ডিত কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হয়ে দিল্লি, জম্মু, হরিয়ানা ইত্যাদি রাজ্যে তাঁবু খাটিয়ে আছেন কয়েক বছর ধরে। তাঁদের হয়ে কেউ কিন্তু একটি কথাও খরচ করেননি।

গোধরায় ৫৬ জন করসেবককে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে শাহ-তদন্ত কমিশন বসিয়েছিল। কিন্তু তখন দুর্নীতির দায়ে জেল-খাটা রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব মহা উৎসাহে আরেকটা কমিশন বসিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণ করা যে, রেল-কামরার ভেতরেই স্টোভ-কুকার জ্বালানোর ফলেই অগ্নিকাণ্ডটা ঘটেছিল। কিন্তু কেন্দ্রের কমিশন ফরেনসিক রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছিল--- ভেতরে কোনও আগুন জ্বালানো হয়নি এবং দরজা বাইরে থেকেই বন্ধ করা হয়েছিল— অর্থাৎ সেটা ছিল সুপরিকল্পিত এক জঘন্য নরহত্যার ঘটনা। অথচ আমাদের আঁতেলরা বা 'প্রগতিশীল' নেতারা এক্ষেত্রে মৌনব্রত পালন করেছেন অত্যন্ত পবিত্র ভঙ্গিতে।

কিছু সংখ্যালঘু মানুষের উদ্যোগে ট্রাম-বাস বন্ধ করা হলো মৌলবাদ-বিরোধী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের শাস্তির দাবিতে। ব্যাস, তিনি এই রাজ্য থেকেই বিতাড়িত হলেন। 'জুলফিকার' সিনেমার অনেকটা অংশ বাদ গেল এই ধরনের প্রতিবাদের ফলে। কিন্তু 'পদ্মাবত' রাজপুত-ভাবাবেগে আঘাত করলেও আঁতেলরা শিল্পীর স্বাধীনতার কথা বলেছেন উচ্চ কণ্ঠে। এই বাংলায় সেটাকে স্বাগত জানানো হয়েছে। মকবুল ফিদা হুসেন 'ভারতমাতা' ও 'মা-সীতার' নগ্ন-মূর্তি এঁকেছেন। হনুমানের কোলে নগ্ন সীতার বীভৎস-নোংরা ছবি আঁকলে সেটাও ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিষয় বলে দাবি করা হয়েছে। কোটি কোটি হিন্দুর ভাবাবেগের কোনও দাম এই 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশে আদৌ নেই।

সুপ্রিমকোর্ট ইমাম-ভাতাকে নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এই রাজ্যের সরকার জানিয়েছে যে, অন্যভাবে সেটা দেওয়া হবে। তাহলে গির্জা, মন্দির, গুরুদ্বারার পূজারিরা কী অপরাধ করেছেন? দুর্গা বিসর্জনের পরের দিন ছিল মহরম। তাহলে, দশমীর দিন সন্ধ্যে ছয়টার মধ্যেই মূর্তি বিসর্জন দিতে হবে কেন? হাইকোর্ট সেটা তিনদিন বাড়িয়েছিল। তাৎক্ষণিক 'তিন-তালাক'-কে সুপ্রিমকোর্ট স্পষ্টতই নিষিদ্ধ করেছে। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনকে কয়েকটা দল সমালোচনা করল কেন? সংবিধানের তৃতীয় তপশিল অনুসারে রাজ্য মন্ত্রীদের শপথ নিতে হয় 'in the name of god'। 'ঈশ্বর' 'আল্লা', 'গড' তো একইজন। তাহলে কেউ কেউ ঈশ্বর ও আল্লা দুই নামে শপথ নিলেন কেন? কেন মনমোহন সিংহ বলেছিলেন— দেশের সম্পদে অগ্রাধিকার মুসলমানদের? কাঠুয়া-কাণ্ডের সত্য ঘটনা প্রকাশ বা প্রচার করা হলো না কেন?

একটা বালিকাকে হরণ করে সংখ্যালঘু অঞ্চলে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু পুলিশের সেখানে ঢোকার অনুমতি নেই। সংবাদটা পড়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলাম— কলকাতা কি ভারতের মধ্যে নয়?

বারাণসীতে এক সন্ধ্যায় দেখি সবাই ছুটছেন। প্রশ্ন করতেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সবাই বলল পালিয়ে যেতে। দ্রুত হোটেলে গিয়ে শুনলাম, এখনই প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা আসবে। মুসলমানরা আক্রমণ করবে— রক্তারক্তি হবে।

বারাণসী তাহলে এই 'সেকুলার' রাষ্ট্রের অংশ নয়? স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীরা এর উত্তর দেবেন কি? ■

উন্নয়ন ও পরিবেশকে একসঙ্গে রেখেই হোক পরিবেশ আন্দোলন

মোহিত রায়

পরিবেশ এখন কাগজে-কলমে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা সবাই চাই দূষণমুক্ত পরিবেশ। পৃথিবী দিনে দিনে দূষণে জর্জরিত হয়েছে। ভারত বা পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অনেক সময়ই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নিয়ে বিশেষত অর্থনৈতিকভাবে উন্নত শহরবাসীদের একটি অংশ খুব সোচ্চার হন। শুনতে খুব ভালো লাগে যে, পরিবেশের জন্য এঁরা সংগ্রাম করছেন, যাতে উপকৃত হবেন সব মানুষ। কিন্তু অনেক সময়ই যাঁরা এইসব নিয়ে আন্দোলন করেন, লেখালেখি করেন তাদের নিজের জীবনযাত্রার জন্য যে ব্যাপক দূষণ হয় সে কথাটা মনে রাখতে চান না। এখন পরিবেশ চর্চায় একটা কথা চলে যাকে বলে 'কার্বন ফুট প্রিন্ট' অর্থাৎ একজনের রোজকার জীবনে কতটা কার্বনের খরচ হয়। কার্বনের খরচ মানে দূষণ। কার্বনের খরচ মানে মূলত আমাদের যে কোনও জিনিস উৎপন্ন করতে তা খাবার বিস্কুট, চাল-ডাল বা জামাকাপড় যাই হোক, তার জন্য লাগে শক্তি যা মূলত কয়লা বা তেল পুড়িয়ে উৎপন্ন হয়। কয়লা বা তেল হচ্ছে কার্বন দিয়ে তৈরি যৌগ। এখন শহুরে পরিবেশপ্রেমীরা বাড়িতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন (আলো, ফ্রিজ, মাইক্রোওভেন, এয়ারকন্ডিশনার, কম্পিউটার), তাদের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, তাদের জামাকাপড়ের সংখ্যা, তাদের খাবারদাবারের মান ও পরিমাণ— এসবের জন্য তাদের যে কার্বন খরচ হয় তা একজন গ্রামের মানুষের অন্তত দশ গুণ। তারা এসব কমানোর কথা না বলে বিভিন্ন শিল্প ও উন্নয়ন প্রকল্পে বাধা দেন যে এসব হলে

দূষণ বাড়বে। কিন্তু শিল্প ও উন্নয়ন না হলে যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়বে না সে কথাটা পরিবেশবাদীরা চেপে যান।

সারাদিন রোদে জলে পুড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে সুন্দরবনের নদীতে চিংড়ির মীন ধরেন যে দরিদ্র মহিলা তাঁকে প্রশ্ন করলে জানি যে সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে আগ্রহের কোনও অবসর তাঁর নেই। বনবাসী স্কুলছাত্রীটি আমাকে বলতে চেয়েছিল কোনও জীববৈচিত্র্য ছাড়াই তো আপনারা কলকাতায় অনেকগুণ ভালো আছেন তবে আমাদের গ্রামে কেন জীববৈচিত্র্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য এত কিছু করতে হবে। আমেরিকান সাহেবের বিপুল বিদ্যুৎ খরচের খতিয়ানকে গালমন্দ করতে করতে পাশে তাকিয়ে দেখি মগরাহাট থেকে ডিম বিক্রি করতে আসা হালিমা বিবিকে যাঁর বাড়িতে কোনওদিন বিদ্যুৎ প্রবেশ করেনি।

পরিবেশের ধুয়ো তুলে নিজেদের কর্মসিদ্ধির সবচেয়ে বড় উদাহরণ কলকাতার পাশেই ভাঙড় আন্দোলন। কলকাতার সীমানার ২৫ কিলোমিটার দূরেই ভাঙড় অঞ্চলে রয়েছে চাষের জমি ও মাছের ভেড়ি। এই অঞ্চলটি মূলত মুসলমান অধ্যুষিত। এই অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই মুসলমান সমাজবিরোধীদের ঘাঁটি এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ একেবারেই মামুলি ব্যাপার। আগে এই অঞ্চল ছিল সিপিএমের দুর্গ, এখানে সিপিএম নেতা মজিদ মাস্টারের নামে সবাই ভয়ে কাঁপত। এখন সেখানে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেসের কুখ্যাত যুব নেতা আরাবুল ইসলাম। এখানে ভারত সরকারের পাওয়ার গ্রিড সংস্থা বিদ্যুৎ পরিবহণের সুব্যবস্থার জন্য একটি কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু করে। এই কেন্দ্র কোনও বিদ্যুৎ তৈরি করে না, এখানে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আসা বিদ্যুৎকে বিভিন্ন ব্যবহারকারীকে সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুৎ পরিবহণের সুবিধার্থে প্রয়োজনমতো আবার উচ্চ ভোল্টে রূপান্তরিত করে বিভিন্ন দিকে সরবরাহ করে। এভাবেই বিদ্যুৎকে দিকে দিকে পরিবাহিত করা হয়, এতে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে, কলকারখানা উচ্চমানের বিদ্যুৎ পায়, উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলে। এই বিদ্যুৎ পরিবাহী টাওয়ার আমাদের

কলকাতার বাতাসে বিষ

কলকাতায় যারা থাকেন বা কর্মসূত্রে নিয়মিত যাতায়াত করেন, তাদের মধ্যে অনেকেরই শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত অসুখ বাড়ছে। আজকাল রাস্তায় বেরোলে অনেকেই নাম-মুখ ঢেকে বেরোন। এর কারণ, কলকাতার বাতাসে ক্রমশ বাড়তে থাকা দূষণ। আগে বলা হতো শীতকালে কলকাতার বাতাসে দূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু এখন কলকাতার বাতাসে সারাবছরই বিষ। সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী কলকাতার বাতাসে ধুলো এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থের পরিমাণ ২.৫ মাইক্রন। চিকিৎসকদের অভিমত, এই বিপুল দূষণ মানবশরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। দূষণ মাপার যেসব মাপকাঠি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো পিএম ২.৫। এই মাপকাঠিতে কলকাতার বাতাস মারাত্মক ক্ষতিকর। এই বিষ বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার ফলে মানুষের ফুসফুসের চরম ক্ষতি হচ্ছে। ঘরে ঘরে এখন হাঁপানি। হার্ট অ্যাটাকের ঘটনাও অনেক বেড়ে গেছে। গত কয়েক বছরে দূষণ বেড়ে গেছে অনেকটাই। ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বড়ো সমস্যা। আর্সেনিক এক ধরনের রাসায়নিক। আর্সেনিকযুক্ত জল খেলে মানবশরীরে নানারকম বিকৃতি দেখা যায়।

বাতাসে পি এস -২.৫-এর পরিমাণের নিরিখে কে কোথায় দাঁড়িয়ে—

কানপুর - ১৭৩, ফরিদাবাদ - ১৭২
বারাণসী - ১৫১, গয়া - ১৪৯
পাটনা - ১৪৪, দিল্লি - ১৪৩
লক্ষনৌ - ১৩৮, আগ্রা - ১৩১
মুজফ্ফরপুর - ১২০, শ্রীনগর - ১১৩
গুরুগ্রাম - ১১৩, জয়পুর - ১০৫
পাতিয়ালা - ১০১, যোধপুর ৯৮

ভারতের ৯টি দূষিত নদী

মুসি - হায়দরাবাদ। যমুনা - দিল্লি
সবরমতী - আহমেদাবাদ
গঙ্গা - এলাহাবাদ। কুয়াম - চেন্নাই
মিঠি - মুম্বাই। মুলা-মুঠা - পুণে
গোমতী - লক্ষ্ণৌ। বিশ্বভবতি - বেঙ্গালুরু

পরিচিত দৃশ্য। একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা দিয়ে এটির তারগুলি যায় যাতে এর থেকে কোনও ক্ষতি না হয়। সারা পৃথিবীতেই এই একই ব্যবস্থা চলে।

পাওয়ার গ্রিড কেন্দ্রের কাজ শুরু হবার ফলে এখানে জমির দাম বেড়ে গেছে অনেকগুণ। শহরের কাছের এইসব জমি একদল লোক আগেই সস্তায় কিনেছিল, কখনো কিছুটা শক্তি প্রদর্শন করেও কিনেছিল।

এখন দাম বেড়ে যাওয়ায় সেইসব গ্রামের লোকেরা চাইছে তাদের জমি ফিরিয়ে নিয়ে বেশি দামে বেচতে। এই নিয়ে শুরু হলো দু'দলের জমির লড়াই। এর মধ্যে একদল শহুরে পরিবেশবাদীরা বললো এই বিদ্যুৎ পরিবহণের জন্য নাকি চাষের, মাছের ক্ষতি হবে, মানুষের ক্ষতি হবে। ফলে এটা হয়ে গেল পরিবেশের লড়াই। দু'দলের হাতেই প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, ফলে দু'পক্ষেই চলছে খুনখারাপি। জমি ও পরিবেশের লড়াইয়ে ঢুকে গেছে কতিপয় নকশালপন্থী। এদের প্রচারের জন্য প্রয়োজন গ্রামের মানুষদের, যাতে শহরের উন্নয়ন বিরোধী সুখী পরিবেশপ্রেমীরা এই জমির খুনোখুনিকে বেশ একটা পরিবেশের বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে খবরের কাগজে, সোশ্যাল মিডিয়ায় চেঁচামেচি করতে পারে। সবচেয়ে মজার কথা, দু'দল মুসলমান গ্রামবাসীর জমির লড়াইয়ে পুলিশ মার খেয়েছে, পুলিশের প্রায় গোটা দশেক গাড়ি পুকুরে ফেলে বা ভাঙচুর করে নষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু পুলিশ কিছু করেনি। কারণ কিছু করলেই সেটা মুসলমান বিরোধী কাজ হয়ে যাবে। অথচ এই আন্দোলনের জন্য ভয়ঙ্কর ইউপিএ আইনে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে আট হিন্দু নকশালের নামে।

এইভাবে পরিবেশের নামে উন্নয়নের কাজ, শিল্পায়নের কাজ স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে দেশজুড়ে। গরিব দেশে পরিবেশ ভাবনাকে জোরদার করতে এসেছে বিদেশি অর্থ সাহায্যের ঢল, সেই টাকায় গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য এনজিও। পরিবেশকে সামনে রেখে কখনো গরিব দরদি, কখনো দেশীয় ঐতিহ্যের কথা বলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে পরিবেশ আন্দোলন। দেশের শিল্প, পরিকাঠামো, কৃষি ইত্যাদির উন্নয়ন থমকে দাঁড়াচ্ছে এই এলিট আন্দোলনে। পরিবেশ ভাবনা বলতে এই উন্নয়ন বিরোধী পশ্চিমি পরিবেশ ভাবনাই একমাত্র স্বীকৃতি পেয়েছে। মহানগরবাসী অভিজাত সচ্ছল বর্গের পরিবেশ প্রেম এবং এনজিওগুলির অর্থের চাকচিক্যে পরিবেশ প্রেম পরিবর্তিত হলো পরিবেশ বিলাসে। হিমালয়ের চিপকো আন্দোলন যা ছিল একেবারেই স্থানীয় মানুষের জঙ্গলের গাছ কাটার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক আন্দোলন, তা হয়ে গেল পরিবেশ আন্দোলন। ওড়িশার নিয়মগিরি পাহাড়ের ধর্মীয় পবিত্র অঞ্চলের দাবি হয়ে গেল পরিবেশের দাবি, বন্ধ হয়ে গেল অ্যালুমিনিয়াম আকর খনির প্রকল্প। আজকের পরিবেশ আন্দোলনের কাজ হবে উন্নয়ন ও পরিবেশকে একসঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলা। ■

জ্ঞানপাপীদের পরিবেশ চিন্তা ও পূর্বকলকাতার জলাভূমি

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

ভি. এস. নইপল কোনো এক প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, 'Everything in India is symbolic.' কথাটা প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ করে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তো বটেই। আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই পরিবেশ ধ্বংস ও সুন্দরের রক্ষণাবেক্ষণের

প্রশ্নে উদাসীন থেকে ৫ জুন এলেই পরিবেশ দিবস পালনে আমাদের সচেতনতার বন্যা বয়ে যায়। কলকাতার ক্ষেত্রে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তাহলে দেখব পূর্ব কলকাতা জলাভূমির প্রশ্নে নইপলের উপলব্ধি কতোটা সত্যি। গুয়াহাটি শহরের ক্ষেত্রে যেমন দ্বীপোর বিল, মণিপুরের ইম্ফলে লোকটাক লেক, তেমনই কলকাতার ক্ষেত্রে বিশেষ এই জলাভূমি। প্রতিটি শহরের ক্ষেত্রেই এগুলো প্রাণ-ধমনী বিশেষ। এই তিনটি জলা অঞ্চলই বিশ্বে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে র‍্যামসার সাইটের মর্যাদা পেয়েছে।

একটা সময় ছিল যখন তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণার ঝড় উঠেছিল। সেই ঝড়ে পড়া আম কুড়োতে শামিল হয়েছিল অনেকেই। সেই ঝড় এখন থেমেছে। জায়গা নিয়েছে পরিবেশ। বর্তমানে পরিবেশ আন্দোলনের ময়দানে রিয়েল এস্টেট মাফিয়া, রাজনীতিজীবী নেতা থেকে ফুলব্রাইট ভুঁইফোড় পরিবেশবিদ পর্যন্ত শামিল হয়েছে। প্রসব করছে একের পর এক ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট, স্ট্যাটাস রিপোর্ট। অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেমিনার, কর্মশালা। দিনের বেলায় প্রকৃতি সংরক্ষণের আলোচনায় অংশ নিয়ে, জলাভূমি দিবসের মিছিলে পা মিলিয়ে রাতে রাজারহাটে লটারির প্রত্যাশায় অনেকেরই দিন কাটছে।

পূর্ব কলকাতার এই জলাভূমি মহানগরীর একাধারে ফুসফুস, বৃক্ক (কিডনি) ও জলাধারের কাজ করছে। নিয়ন্ত্রণ করছে জলবায়ু ও সেইসঙ্গে নীলকণ্ঠের মতো গরল পান করে উজাড় করে দিচ্ছে শহরবাসীকে মাছ ও সবজি। বিশ্বব্যাঙ্কের মতে এটিই বিশ্বে বড়ো শহর ঘেঁষা বিশ্বের বৃহত্তম জলাভূমি।

২০০০ সালের মার্চ মাসের কথা। বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যে ও ভারত সরকারের উদ্যোগে আমাদের কলকাতা জলাভূমির পরিবেশগত মূল্যায়ন-জনিত গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে রাজারহাটে প্রায় দৈনিক যেতে হতো। এমনই একদিন মহিশগোটে বৃদ্ধা সাগরবালা মণ্ডলের মুখোমুখি হই। ছোট্ট টালির বাসায় দুই অপ্রকৃতিস্থ ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাস করতেন তিনি। জগৎপুরের বাজারে কচু আর শাক বিক্রি করে তাঁর সংসার চলত। উপনগরী পত্তনের জন্য পর্ণকুটিরের তিনদিকে আবাসন পর্ষদ ছ'ফুট উঁচু পাঁচিল তুলে দিয়েছিল। সাগরবালার মতো কয়েক লক্ষ মানুষকে উচ্ছেদ করে ৩ হাজার ৭৫ হেক্টর জমিতে দেড় লক্ষ মানুষের জন্য আজ গড়ে উঠেছে আধুনিক উপনগরী। সিঙুরের একশো হেক্টর জমি রাজারহাটের কাছে নিতান্তই শিশু। ১৯৯৫ সালের ১ জুন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী যখন এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন তখন প্রচার পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ ছিল—এই এলাকায় কোনও মাছ চাষের ভেড়ি বা স্থায়ী জলাশয় নেই।

প্রচার আর বাস্তবে মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। রাজ্য সরকারেরই সংস্থা ইনস্টিটিউট অব ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল ডিজাইন থেকে পাওয়া পূর্ব কলকাতার এক উপগ্রহ মানচিত্র বলছে ২২°৪০´ উত্তর থেকে ২২°৩০´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°২০´ পূর্ব থেকে ৮৮°৩০´ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যবর্তী অংশের ৮০ শতাংশই জলাভূমি। যেটা খেয়াল করার, ছবিটা তোলা হয়েছিল ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭। অর্থাৎ শীতকালে, যখন জল খুব কম থাকে। উল্লেখ্য বর্তমানে উপগ্রহ মানচিত্র হলো সবচেয়ে বেশি আধুনিক ও গ্রহণযোগ্য ছবি।

এই উপনগরীর ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র প্রকাশ করে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া সেখানে পাঁচ ধরনের গঠন প্রকৃতির কথা বলেছে। এগুলো হল ঃ (১) নদীতীরের স্বাভাবিক বাঁধ (Livee/Crevasse) (২) পরিত্যক্ত নদীগর্ভ (Abandoned Channel) (৩) বাঁধ অঞ্চল (Point bar) (৪) কর্দমাক্ত জলাভূমি (Backswamp/Tridal mud flat) (৫) লবণাক্ত জলাভূমি (Salt marsh)। এহেন ভূ-প্রকৃতির এমন পরিকল্পিত অপব্যবহার ও মহানগরীর অপরিকল্পিত

বিস্তারের মধ্যে অনিবার্য অবলুপ্তির দিকে চলেছে ঈশ্বরের এক অনবদ্য প্রাকৃতিক অবদান পূর্ব কলকাতা জলাভূমি। বর্তমানে এরাজ্যে জলাভূমি সংক্রান্ত কোনও আইন নেই। রাজ্য মৎস্য দপ্তরের ইন্ডিয়ান ফিশারিস অ্যাক্ট ১৯৮৪ এবং তার সংশোধনীই এখানে জলাভূমি রক্ষার একমাত্র আইনগত রক্ষাকবচ।

রাজ্য উন্নয়ন পর্ষদের ১৯৮৫ সালের রিপোর্টকে ভিত্তি করে রাজ্য পরিবেশ দপ্তর বর্জ্য পুনর্ব্যবহার অঞ্চল হিসেবে যে মানচিত্র গঠন করেছে সেটি ১৯৯২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের এক রুলিং কড়াইডাঙা মৌজাকে সংরক্ষিত ১০৬৯৫ হেক্টর অঞ্চলের বাইরে দেখানো হয়। হাইকোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশে সংরক্ষিত অঞ্চলে কোনরকম নির্মাণকার্য নিষিদ্ধ হলেও ট্যানারি স্থানান্তর সংক্রান্ত সুপ্রিমকোর্টের রায় সেই রায়কেই নস্যাৎ করেছে। ফলে মসৃণ হয়েছে কড়াইডাঙায় চর্মনগরী নির্মাণ।

বর্তমানে নানা ধরনের প্রচারমাধ্যমে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির মোট এলাকা ১২৫০০ হেক্টর বলা হচ্ছে। এই হিসেবে রাজ্য সরকার নির্ধারিত বর্জ্য পুনর্ব্যবহার অঞ্চলের বাইরেও কিছু অঞ্চল জলাভূমি হিসেবে দেখানো হয়ে থাকতে পারে।

বর্তমানে বর্জ্য পুনর্ব্যবহার অঞ্চল হিসেবে যে এলাকাটি চিহ্নিত করা হয়েছে সেটি ১৯৬০ সালের মানচিত্রের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হলেও কড়াইডাঙা, গঙ্গাপুর ও ভাতিপোতার মতো মৌজাগুলি এই সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে রাখা হয়নি (অনুমান করা যায় চর্ম নগরীর কথা মাথায় রেখে)। অন্যদিকে রাজারহাট উপনগরী প্রকল্পের অন্তর্গত মহিশগোট, মহিশবাথান, ঘুনি, যাত্রাগাছি, রেকজুয়ানি ও থাকদারির মতো মৌজাগুলিকেও সংরক্ষিত এলাকার বাইরে রাখা হয়েছে। একই ভাবে বাইপাস সংলগ্ন আনন্দপুর ও মাদুরদহ-র মতো মৌজা দুটিও সংরক্ষিত অঞ্চলের বাইরে থাকায় এগুলি গত কয়েক বছরে আগ্রাসী নগরায়নের মর্মান্তিক শিকার হয়েছে। এই মৌজা দুটি ১৯৯৯-২০০০ সময়ে জলাভূমির সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবস্থান করছিল।

আশির দশকে রাজ্য মৎস্য দপ্তরের আইনটি কার্যকর হওয়ার পর থেকেই জনসাধারণের মধ্যে জলাভূমি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৬ সাল থেকে ১ আষাঢ় দিনটিকে রাজ্য সরকার জলাভূমি বাঁচাও দিবস হিসেবে পালন করছে। পিপল্‌স গ্রিন কোর্ট, রাজারহাট মণ্ডলগাথি উন্নয়ন সমিতি, পিপ্‌ল ইউনাইটেড ফর বেটার লিভিং ইন ক্যালকাটা (PUBLIC) প্রভৃতি বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে এসেছে জলাভূমি রক্ষায় জনমত গঠনে ও আইনের সাহায্য নিতে।

১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'ক্যালকাটাস আরবান ফিউচার' গ্রন্থের মুখবন্ধে ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই বিলীয়মান জলাভূমির ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ গোপন করেননি। অথচ তিনিই পরবর্তীকালে উদ্যোগী হয়েছিলেন চারশো একর অতি উর্বর কৃষিজমিতে গ্রাঁ প্রী-র ট্রাক নির্মাণে। এসবের জন্য এযুগের উপেনদের কোনও চানাচুরওয়ালা বা জুতোর কারবারি বলছে, 'ওটা দিতে হবে।' তাই সাগরবালা মণ্ডল আর আলাউদ্দিনরা লিখে দিচ্ছে 'বিশ্ব নিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে'। গড়ে উঠেছে বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি, কসবা, লেকটাউন, বিধাননগর, নিউটাউন প্রভৃতি। বিদ্যাধরী স্পিল কো-অপারেটিভ ফিশারিজ বিলীন হচ্ছে বিদ্যাসাগর, লাবণী, বি.ডি. মার্কেটের নিচে। কাঁকড়ামারি ভেড়িতে গড়ে উঠছে ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টার। বড় ভেড়ি, দাসের ভেড়ি, নেড়াতলার খাস ভেড়ি চলে যাচ্ছে বৈশাখী, দিগন্তিকা, ময়ুখ ভবন আর স্টেডিয়ামের তলায়। সেদিনের বাগের ভেড়িই আজকের ঝিলমিল।

এক নগরী সর্বস্ব পশ্চিমবঙ্গে পরলোকগত ডাক্তার মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বব্যাঙ্কের কথা না শুনে লবণহ্রদ উপনগরীর পরিকল্পনা করে নিজেরই অজান্তে এ মহানগরীর কফিনে প্রথম পেরেক ঠুকেছিলেন। আমরা যারা উঠতে বসতে বিশ্বব্যাঙ্কের নিন্দে করি তারা বোধহয় জানি না এই ব্যাঙ্ক লবণহ্রদ পরিকল্পনায় মত দেয়নি। তাতে আমরা কান দিইনি। দিল্লির গ্রাউন্ড ওয়াটার কমিশনকে দিয়ে বলানো হয়েছে সল্টলেকে ভূগর্ভস্থ জল পর্যাপ্ত। তাই যদি হতো তাহলে আজকের বিধান নগরকে পলতার জলে থাবা দিতে হতো না। পরিকল্পনার মতো না হয়ে দাবানলের মতো তাই শহরের এই বিস্তার।

১৪৫০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকার বসবাসকারী প্রায় দেড় কোটি নাগরিকের প্রতিদিনের সৃষ্টি ১৩৫ কোটি লিটার বর্জ্য ও তাতে ভেসে থাকা ২০৭৬ টন বর্জ্য কণার ৭০ শতাংশই কুলটি গাঙে পড়ছে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিশোধিতভাবে। সে কারণেই একদিকে মিষ্টি জলের গঙ্গা হুগলী নদী, অন্যদিকে এই জলাভূমির অবস্থানের দরুন সদ্য প্রয়াত ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ এ শহরকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ইকলজিক্যালি সাবসিডাইজড নগরী বলেছেন। সেই সঙ্গে দুঃখ করে বলেছেন এখানে চলছে জ্ঞানপাপীদের পরিবেশ চর্চা। কোনও বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও এই অনবদ্য বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করতে ছাত্র-ছাত্রীদের আনা হয় না। এমন অমলিন, প্রাকৃতিক শোভা চাক্ষুষ করতেই বা আসে ক'জন।

বর্তমানে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিশ্ববঙ্গ কারনিং সৌন্দর্যায়নের জন্য বেছে নেওয়া হচ্ছে এই মাটির অনাত্মীয় এক ধরনের বৃক্ষকে, যেগুলো সৌন্দর্যে খেজুর গাছকেও লজ্জা দেবে। খেজুর গাছে তবুও শীতে কলসি বাঁধলে দুর্গা টুনটুনি রসের টানে আসে। মাসকাট, দুবাই প্রভৃতি শহরের হাইব্রিড ম্যাকার্থুবি গাছের সারি দিয়ে সৌন্দর্যায়নে নিঃস্ব করা হচ্ছে সাধের বিশ্ববঙ্গকে। ক্যাপটেন ভেরির ধারে কয়েকশো এই গাছ পোঁতা হয়েছে, যেখানে কোনও পাখি বা মৌমাছি বাসা বা চাক বাঁধে না। ফ্রুট, ফিউয়েল শেল্টার কোনও দানের দাবিদার এই গাছ নয়। এখানে নারকেল, বকুল, ছাতিম, কদম স্থান পেলে সারা বছর ফলে, গন্ধে পারিজাত শোভা পেত।

পশ্চিমবঙ্গ যখন স্তালিনবাদীদের শাসনে ছিল সেসময় এক প্রভাবশালী মন্ত্রী বলেছিলেন পরিকল্পিত নগরী গড়তে সব জলাই বুজিয়ে ফেলা দরকার। টালির নালা বা আদি গঙ্গার ওপর আমরা মেট্রো চালাচ্ছি। বর্তমান মেয়র থেকেও নেই। তিনি ভেড়ির ওপর দিয়ে ফ্লাইওভার চাইছেন।

বায়রন বলেছিলেন, যতদিন কলোসিয়ম ততদিন রোম। তেমনভাবে বলা যায়, যতদিন পূর্বদিকের জলাভূমি ততদিন কলকাতা। কিন্তু জ্ঞানপাপীদের বধির কানে সেকথা প্রবেশ করা কঠিন। ▮

ইতিহাসের ধারা

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ইতিহাসে যে দুইটি পরস্পরবিরোধী মনোবৃত্তির পরিচয় যুগ যুগান্তর ধরিয়া গিয়াছে তাহার কথা বলিতেছি। অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগের সর্বপ্রথম বিদেশি আক্রমণের সময় হইতে বিংশশতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুজাতির মধ্যে দেশ, ধর্ম ও জাতির রক্ষক মহাপুরুষগণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং শত্রুতোষণ-পরায়ণতার যে শোচনীয় লজ্জাজনক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

ভারত ইতিহাসের এই কলঙ্কের দিকটা অতি মর্মান্তিকরূপে মনে পড়িয়া যায় সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে একটু অভিনিবেশ সহকারে মনোনিবেশ করিলে। ভারতের হিন্দুজাতির স্বার্থ ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্য পাকিস্তানি বর্বরগণের দ্বারা হিন্দু নারীর সতীত্বের লাঞ্ছনার প্রতিকারের এবং পাকিস্তানের অন্তর্গত হিন্দুর ধর্মস্থানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু ভারতের ইতিহাসের ওই ধারার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। স্বজাতি এবং স্বধর্মের মর্যাদা রক্ষক এই মহান পুরুষের শেখ আব্দুল্লার দেশে রহস্যজনক মৃত্যুতে ভারতের হিন্দুজাতি যে ক্রিয়াত্মকরূপে তাঁহাদের শোকের কিংবা ক্রোধের পরিচয় দেয় নাই, ইহা তাহাদের স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তা অথবা জাতির জীবন-মরণ সমস্যার প্রতি চিরন্তন উদাসীনতাসম্ভূত, তাহা লইয়া কোনও আলোচনা করিব না। তবে ইহা যে হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য, ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনা সেই সত্যের সমর্থন করে।

আজ হইতে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রিক আক্রমণকারী আলেকজান্ডারের দ্বারা পঞ্জাবের হিন্দু রাজা পুরু যখন পরাজিত হইয়াছিলেন, বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সেই সংবাদ জনমনে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। হিন্দু চরিত্রের এই দিকটা যেন সনাতন, অক্ষয় ও অব্যয়। ওই ঘটনার প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরে তুর্কি আক্রমণকারীর হাতে হিন্দু বীর পৃথ্বীরাজ যখন পরাজিত, ধৃত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন, বিশাল ভারত তখনও তাহার বিশালতা লইয়া অবিচলিতভাবে তাহার ধৈর্য রক্ষা করিয়াছিল। অবশ্য পৃথ্বীরাজের ক্রূরশত্রু কনৌজাধিপতি জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজ-নিধনের সংবাদে পুলকিত হইয়া মিষ্টান্ন ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন কি না, সে সংবাদ কোনও ইতিহাসকার লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে বিংশশতাব্দীর ভারতে এই ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কোনও কোনও রাজনৈতিক দলভুক্ত হিন্দুরা সন্দেশ-উৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া গুজব শুনা গিয়াছিল। ইহারা তেরঙ্গা পতাকাধারী কিংবা একরঙ্গা, তাহাতে কিছু যায় আসে না। ইহারা যে হিন্দুবংশজাত 'ইতিহাসের ধারা'র সত্যের জন্য, তাহাই যথেষ্ট।

কিন্তু যাহা গুজব নয়, এইবার তাহার কথাই বলিতেছি। কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুকে প্রমাণ করা অবশ্য কঠিন। কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানারকম খবর, বিবৃতি ও বিবরণ হইতে এই সিদ্ধান্ত প্রায় অপরিহার্য হইয়া পড়ে যে ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা, অমনোযোগ এবং কু-চিকিৎসার ফলেই তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। ভারতের সাধারণ নর-নারী মাত্রেই এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করিলেও, ভারতের শাসনদণ্ডধারী কংগ্রেসদল বিশেষ করিয়া সেই দলের নিরঙ্কুশ নেতা অর্থাৎ ডিক্টেটর কিন্তু ঠিক বিপরীত মতই পোষণ করেন। ভারতে যিনি সর্বত্র লক্ষ লক্ষ নর-নারীর আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, ঘৃণিত নরখাদক কিংবা আইনভঙ্গের অপরাধীর মতো একস্থান হইতে অন্যস্থানে টানা-হেঁচড়া করিয়া লইয়া গিয়া, বিষাক্ত সর্পসঙ্কুল কাননমধ্যস্থিত এক ক্ষুদ্রায়তন কারাকক্ষে আবদ্ধ রাখিয়া এবং কঠিন হৃদরোগ উপস্থিত হইলে চিকিৎসায় দীর্ঘ বিলম্ব ও অনিষ্টকারী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিলেও, শেখ আবদুল্লার গভর্নমেন্ট ভারতের কংগ্রেস গভর্নমেন্টের পূর্ণ সমর্থন পাইয়াছে। হিন্দুর ইতিহাসে বিধর্মী মোগলকে কন্যাদানকারী জাতিদ্রোহী মানসিংহের দল নিন্দিত হইয়া রহিয়াছে। শেখ আবদুল্লার মোগলাই শাসনের সমর্থক এই বিংশশতাব্দীর মানসিংহের দল তাহাদের পূর্ববর্তীদিগের অপেক্ষায় হিন্দুদ্রোহিতায় কম কিসে! ইতিহাসের ধারা ইহারা বজায় রাখিয়াই চলিতেছে।

মানসিংহের কথায় মনে পড়ে তাহার পূর্ববর্তীগণের কলঙ্কময় কাহিনি। যাঁহারা দেশদ্রোহিতায় এবং জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় মানসিংহ জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্বেই পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। একান্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় হইলেও ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না যে, হিন্দুজাতির মধ্যে এ বৈভীষণী মনোবৃত্তি অতি প্রাচীনকাল হইতেই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। ২৩০০ বৎসর পূর্বের ঘটনা হইতেই আরম্ভ করা যাক। ম্যাসিডনরাজ আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করিতে আসিলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম দ্বারে আসিয়াই তিনি প্রিয় অভ্যাগতের মতো সংবর্ধনা পাইলেন তক্ষশীলার রাজা অম্ভীর নিকট। বিদেশি ও বিধর্মী আক্রমণকারীকে বাধা দিবার জন্য বীর পুরু রাজের সহযোগিতা অপেক্ষা নিজের রাজ্যরক্ষা এবং শক্তিশালী ম্যাসিডন রাজের আশ্রয়ে নিরাপত্তা ভোগের ইচ্ছা তাঁহাকে দেশ, ধর্ম ও জাতির প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে অন্ধ করিল। তাহার পর বহু শতাব্দী কাটিয়া গেল। কিন্তু অম্ভীর ঘৃণিত পথের অনুসরণকারীর কি অভাব ঘটিয়াছিল?

প্রায় হাজার বৎসর পরের ঘটনা স্মরণ করিলে দেখিবেন এবারকার দেশদ্রোহিতার কাহিনি কেবল ঘোর কলঙ্কময় নহে, অতি করুণ ও মর্মান্তিক। সিন্ধু আক্রমণকারী মুসলমান আরবগণের সহিত বীরের মতো যুদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ রাজা দাহির প্রাণত্যাগ করিলেন। কথিত আছে, ইহার পরও রাজধানী রক্ষার কার্যে দাহিরের প্রধানা মহিষী স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইযা প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। আরবগণ দলে দলে রাজধানীতে

প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে স্বাগত জানাইয়াছিল পীত পরিচ্ছদ পরিহিত কিছু পুরুষ। পরম উল্লাসের সহিত ইহারা বিধর্মী আক্রমণকারীদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল সেই গোপন স্থানে, যেখানে রাজা দাহিরের দ্বিতীয় ভার্যা আতঙ্কবিহ্বল অবস্থায় লুকাইয়া ছিলেন। ইহা ছাড়া মৃত্তিকায় প্রোথিত স্বর্ণপূর্ণ কলসীসমূহ যেখানে থাকিত, মুণ্ডিতশীর্ষেরা আক্রমণকারীদিগকে সেখানেও পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। সমসাময়িক আরব ঐতিহাসিকের এই বর্ণনাকে নিছক কল্পনা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। অনেকে বলেন এই পীতবসনধারীরা তৎকালীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক। ইহা খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা।

পাঁচ শতাব্দী ডিঙ্গাইয়া চলিয়া আসুন ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায়। চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের সহিত গাহড়বাল বংশোদ্ভব জয়চন্দ্রের কলহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের ইতিহাস পাঠক বালকরাও পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছে। তুর্কি আক্রমণকারী মুইজুদ্দিন মহম্মদ ঘোরিকে বাধা দিবার জন্য বীর পৃথ্বীরাজ যখন সামরিক আয়োজনে ব্যস্ত, জয়চন্দ্র তখন কায়মনোবাক্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় ও নিধন কামনা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ সৈন্যসামন্ত অথবা অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধসামগ্রী সরবরাহ দ্বারা মুসলমান তুর্কি আক্রমণকারীকে সাহায্য করিয়াছিলেন কি না তাহা বলা কঠিন। তবে পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের সামরিক শক্তি একত্রিত হইলে মহম্মদ ঘোরি তরাইনের যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লির সিংহাসনে আসীন হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। স্বজাতির ও স্বধর্মের আততায়ীকে সুযোগ দিয়া জয়চাঁদ যে দেশদ্রোহিতার মসীলিপ্ত কাহিনি রচনা করিয়াছেন, ভারতের হিন্দু তাহা কোনওকালেই বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

কিন্তু জয়চন্দ্র কি একা অপরাধী? কখনই না। জয়চাঁদের দোসর একজন নহে, অনেক। ধরুন মোগল আক্রমণকারী বাবরের সহিত রাজপুত বীর রাণা সংগ্রাম সিংহের যুদ্ধ। বাবরের কামান রাজপুত পরাজয়ের প্রধান কারণ, ইহা সকল ইতিহাসেই উল্লিখিত আছে। কিন্তু শত্রুর কামানের মতোই রাজপুতগণের সর্বনাশের আরও এক কারণ ছিল, ইহা অন্তত জনশ্রুতি দ্বারা সমর্থিত। যুদ্ধক্ষেত্রে রাণার এক সেনাপতি অকস্মাৎ নিজের সৈন্যদল লইয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া স্বজাতির পরাজয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইতিহাসের ধারা অক্ষুণ্ণ রহিল না কি? রাণা সংগ্রাম সিংহের পরাজয়ের প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ স্মরণ করুন। আহমদ শাহ আবদালিকে প্রতিহত করিবার জন্য মরাঠারা সংগঠিত হইল কিন্তু অপর হিন্দুরা করিল অসহযোগ। রাজপুত ও জাঠ যোদ্ধারা বিদেশি আক্রমণের সম্মুখে পেশোয়ার সৈন্যকে ঠেলিয়া দিয়া নিজেরা সরিয়া দাঁড়াইল। অপরপক্ষে, ভারতীয় মুসলমানদের নেতারা, যথা অযোধ্যার নবাব ও রোহিলা সর্দারেরা বিদেশি মুসলমান আক্রমণকারীকে সাহায্য করিতে সোৎসাহে অগ্রসর হইল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই নিজ নিজ ইতিহাসের ধারা বজায় রাখিল।

বর্তমান সময়ে নাকি ভারতের নবজাগরণ হইয়াছে। ব্রিটিশ পরিত্যক্ত স্বাধীন ভারত নাকি জাতীয় জীবনের এক নূতন এবং গৌরবময় অধ্যায় রচনা করিতে লাগিয়া গিয়াছে। ইহা সত্য হইলে, সকল ভারতবাসীই যে আনন্দিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দু জাতির মধ্য হইতে জয়চাঁদ-মানসিংহ গোষ্ঠীর উচ্ছেদ তো হয় নাই! শুধু তাহাই নহে, স্বধীন ভারতের মান সিংহ(অথবা অপমান সিংহ) তথা জয়চাঁদেরা সগর্বে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে এবং বৈভীষণী মনোবৃত্তিকে এক নূতন ছদ্মনামে পরিচিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নামটি হইতেছে --- 'অসাম্প্রদায়িকতা' অথবা 'সেকুলারিজম'।

এই বিষয়ে ইহারা জয়চাঁদ-মানসিংহের দলকেও হারাইয়াছেন। সেকালের কুলদ্রোহী তুর্কি মোগলের সহায়ক হিন্দুরা খোলাখুলি স্বীকার করিতেন যে, তাহারা বিধর্মী ও বিজাতির দলে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর মানসিংহ সম্প্রদায় ও জয়চাঁদের গোষ্ঠী কিন্তু এ বিষয়ে সত্য ও সততার ধার ধারেন না। মুসলমান তেষণ ও হিন্দুদ্রোহিতাকে তাহারা 'সেকুলারিজম' নাম দিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিতে সদাই চেষ্টিত। হিন্দুর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার কথা বলিতেন বলিয়া ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন সাম্প্রদায়িক এবং পণ্ডিত নেহরুর চক্ষুশূল। কিন্তু মুসলিম সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির জীবন্ত মূর্তি শেখ আবদুল্লা হইতেছেন অসাম্প্রদায়িক এবং পণ্ডিতজীর প্রাণের বন্ধু। নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরে প্রবেশের সময় পণ্ডিতজী সকলকে ঘটা করিয়া জানাইয়া দিয়াছিলেন যে তিনি হিন্দুর দেবমূর্তি দেখিতে আসেন নাই, আসিয়াছেন মন্দিরের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যবিদ্যা দেখিতে। পাছে লোকে তাঁহাকে হিন্দু মনে করিয়া বসে। কিন্তু কলিকাতার সভায় মুসলমানেরা কোরান পাঠ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলে তিনি খুশিই হইয়াছিলেন। হিন্দু সন্তানের হিন্দু বিরোধিতা ও হিন্দুদ্রোহিতার বেশি বিবরণ ও আলোচনা করাও লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়।

কিন্তু জয়চাঁদ, মানসিংহ ও নেহরুপন্থী হিন্দুরা যেমন জাতীয় চরিত্রের মসীলিপ্ত দিকটা দেখাইয়া দিতেছে, তেমনি হিন্দু চরিত্রের উজ্জ্বল দিকটাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। পুরুরাজ, দাহির, পৃথ্বীরাজ হতে আরম্ভ করিয়া রাণা সঙ্গ, রাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, বালাজী বাজীরাও প্রমুখ হিন্দু জাতির রক্ষক ও প্রতিপালক মহাপুরুষরা ইতিহাসের ধারার গৌরবময় দিকটি আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছেন। হিন্দুজাতি যে বাঁচিয়া আছে, জয়চাঁদ- মানসিংহ ও নেহরুপন্থীদের জাতিদ্রোহিতার ফলে এই প্রাচীন ধর্ম যে একেবরে বিনষ্ট হয় নাই, তথাপি মনে রাখিতে হইবে হিন্দুজাতির মধ্যে একটি আদর্শ প্রবলতর হইয়া অপরটিকে দমিত, এমনকী বিলুপ্ত করিতে পারিবে এমন সময় আজ উপস্থিত। বর্তমানে ভারতে ও ভারত সীমান্তে ইসলামের শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে— এই ব্যাপারটির মধ্যে কী গভীর অর্থ নিহিত আছে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তাহা বুঝিতে পারিবেন। সেইজন্য বৈভীষণী মনোবৃত্তিকে হিন্দুজাতির মধ্য হইতে একেবরে উৎসন্ন করিতে না পারিলে, এবার তাহার যে বিষম অনর্থ ঘটিবে, পূর্ব পূর্ব যুগের যে-কোনও সঙ্কট তাহার তুলনায় তুচ্ছ।

(স্বস্তিকা, পূজা সংখ্যা, ১৩৬০)

জাতপাতের রাজনীতি

স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যায় (১৬.০৪.২০১৮) 'জাতপাতের রাজনীতি : বর্তমান সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধে এমন কয়েকটি কথা লেখা হয়েছে, দীর্ঘদিনের পাঠক হিসেবে মনে হচ্ছে স্বস্তিকা পত্রিকার আদর্শের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ওই কয়েকটি কথা নিম্নরূপ :

''এসবে চোখ না ফেলে হিন্দু-ঐক্য নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে পতাকা নাড়িয়ে এখন কিছু হবে না।''

''সমরসতা বলা সোজা—মানসিকভাবে বর্ণাভিমান তুলে যথার্থ সমরসতার ভাব আয়ত্ত করা কঠিন।''

''গণবেশ পরে—বিজাতীয় ভাষায় সূর্যপ্রণাম নিশ্চয় ভারতীয় সংস্কারের আলো ছড়ানোর ব্যবস্থা, কিন্তু সমাজের তরঙ্গ বোঝায়— সে তরঙ্গ থেকে সময়ানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা না থাকলে পশ্চিমবঙ্গের বিপদ আরও জটিল হবে। ...আমার যথার্থ সম্মান কিন্তু এই গণবেশ সমাবেশে নেই।''

—সত্যনারায়ণ মজুমদার,
পুড়াটুলি, মালদা।

একজন দর্শকের চোখে স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যা (১৪২৫)-র উন্মোচন অনুষ্ঠান

'স্বস্তিকা' আজ দীর্ঘদিনের একটি সৎ সুস্থ, রুচিশীল সংবাদ সাপ্তাহিক। নীরবে এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে, কারোরই অভিনন্দন, বাহবার তোয়াক্কা না করে! কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে সকল শুভানুধ্যায়ী, দর্শক পাঠকদের সামনে এসে উপস্থিত হলো 'স্বস্তিকা' গত ১৪ এপ্রিল, ২০১৮, ৩০ চৈত্র, ১৪২৪ গণেশচন্দ্র এভেনিউ-এর 'সুবর্ণ বণিক সমাজ' হলে।

হল-গেটের মুখে দেখা হলো প্রিয় পত্রিকা-সম্পাদক শ্রী বিজয় আঢ্য ও পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দরদি কর্মীবৃন্দের সঙ্গে। তাঁরা আমাকে গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সৌজন্যে ভরিয়ে দিলেন! বলতে গেলে সাম্প্রতিককালে এই ধরনের ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দেখতে পাওয়া যায় না! এবার হলে ঢুকে চা-পানের সময় দেখা হলো বিদগ্ধ-মানস অধ্যাপক ডক্টর স্বরূপ প্রসাদ ঘোষের সঙ্গে। এখানে বিনিময় নীরব সৌজন্য। এরপর সামনা-সামনি প্রীতিভাজন সাংবাদিক-বন্ধু রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গভীর আন্তরিকতায় ভরে গেল এই সাক্ষাৎ-মুহূর্তটি। দেখতে দেখতে উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী এসে গেলেন অনুষ্ঠান-মঞ্চে।

এবার উদ্বোধনী সংগীত। 'সংস্কার ভারতীর' সভ্যরা পরিবেশন করলেন সেই বিখ্যাত সংগীত 'উঠ গো ভারতী লক্ষ্মী, উঠ আদি জগতজনপূজ্যা'...। ভারতমাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন হলো প্রদীপ জ্বালিয়ে। এবার ১৪২৫-র 'স্বস্তিকা' সম্মাননা দেওয়া হলো গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাসকে। শ্রদ্ধেয় বিশ্বাস সময়োপযোগী দু-চারটি কথায় এই সম্মাননার উত্তর দিলেন। পত্রিকার প্রকাশক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রিকার প্রচার প্রত্যাশা মতো না-হওয়ার আক্ষেপ শ্রোতাদের মনে খুবই স্পর্শ করল। এবার মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন সভার প্রধান বক্তা উৎসর্গিতপ্রাণ শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রেশজী। সাবলীল, স্বচ্ছ, সরল ভঙ্গিতে ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির মূল সুরটি নানা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বর্ণনা করলেন। সকল শ্রোতা মুগ্ধ বিস্ময়ে ইন্দ্রেশজীর এই আলোচনা শুনলেন। প্রধান অতিথি মাননীয় রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীজী সহজ, সরল ইংরেজিতে বিগত ৭০ বছর ধরে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অবিচলিত থেকে স্বস্তিকা পত্রিকা প্রকাশের তাৎপর্য তুলে ধরলেন।

সভার সমাপ্তি এক তরুণের উদাত্তকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত পরিবেশনে। 'হল' ছাড়ার মুখে 'স্বস্তিকার' 'ডিজিটাল রূপও' দেখতে পেলেন শ্রোতারা। এবার বাড়ির দিকে রওনা দেবার পালা। এমন সময়

দীর্ঘদিনের পুরাতন সহধর্মী 'স্বস্তিকার' শুভানুধ্যায়ীর বন্ধু স্বপন দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা। আমরা দু-জনেই এই সাক্ষাতে আপ্লুত, বিস্মিত। ফিরতে ফিরতে মনে হলো 'স্বস্তিকার' বিশেষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠান আমাদের দিয়ে গেল সুস্থ শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার প্রেরণা। 'জয়তু স্বস্তিকা'—স্বস্তিকার জয় হোক।

—রণজিৎ সিংহ,
সিঁথি, কলকাতা।

অধীরবাবুর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ

অধীরবাবু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের থেকে বড় কথা তিনি বহরমপুর লোকসভা থেকে দীর্ঘ বাইশ বছরের সাংসদ আর আমি তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের একজন বাসিন্দা। তাই এই চিঠি নিছক স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে নিয়েই।

অধীরবাবুর উত্থানের বিস্তারিত এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা সম্ভব নয়। আর এস পি-র শক্ত ঘাঁটি এই লোকসভা কেন্দ্রে অধীরবাবুর প্রথম জয় নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে। এর আগের লোকসভা নির্বাচনেই তাঁর দল তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। সেই সময় আর এস পি জিতলেও দ্বিতীয় হন বিজেপির কর্নেল সব্যসাচী বাগচী। তিনি আড়াই লক্ষের কাছাকাছি ভোট পান। এটা বলার উদ্দেশ্য হলো সেই যুগে বিজেপির একটা ভালো ভোটব্যাঙ্ক ছিল এই লোকসভায়।

তারপর থেকে বহরমপুর বা জেলার রাজনীতি শুধুই অধীরবাবুকে কেন্দ্র করে। তাঁর লোকসভার অন্তর্গত তিনটি পৌরসভা বহরমপুর, কান্দি, বেলডাঙ্গা তারপর থেকে কংগ্রেসের দখলে। শেষ লোকসভা নির্বাচনেও তাঁর জয়ের ব্যবধান যে-কোনও

জনপ্রতিনিধির কাছে ঈর্ষণীয়।

এই অধীরবাবুকে হারাতে বাম আমলেও কম প্রয়াস হয়নি। কিন্তু আজ অধীরবাবু সত্যিই সঙ্কটে। তাঁর জেলায় কী অবস্থায় তিনি আছেন তা আর লিখতে হবে না। তাঁর এই অবস্থায় তাঁর দলের হাইকমান্ড কতটা তাঁর সঙ্গে থাকবে তা বলা কঠিন। কারণ তাঁর সব থেকে বিরোধীকে যে তার দলের হাইকমান্ডের আগামী দিনে চাই। এই অবস্থায় রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তাঁকে লোকসভাতে হারাতে তৎপর। আগামীদিনে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে তাঁর জয় সত্যিই খুব কঠিন, কারণ রাজ্যে বা কেন্দ্রে কোথাও কংগ্রেস নেই। তাই এই অবস্থায় কংগ্রেস করে তাঁর সঙ্গে কঠিন লড়াই করার মতো লোক খুব কম থাকবে।

তাই এই মুহূর্তে তাঁকে বিকল্প ভাবতেই হবে আর বিকল্প একমাত্র বিজেপি। আমাদের থেকে বহু গুণ অভিজ্ঞ অধীরবাবুও সেটি মনে হয় খুব ভালো ভাবে জানেন। কিন্তু তাঁর যেটা ভাবনার কারণ সেটা হয়তো মুসলমান ভোট। বহরমপুরের অর্ধেক ভোটার মুসলমান। অধীরবাবু হয়তো সেটি ভাবছেন। কিন্তু তিনি কংগ্রেস থেকে দাঁড়ালেও যে অধিকাংশ মুসলমান ভোট উনি পাবেন তাও নয়, আবার বিজেপির ভোট এই লোকসভাতে অনেক বাড়বে এই বার। আগেই বলেছি, বিজেপির ভালো ভোট কিন্তু এখানে আগে ছিল। এই অবস্থায় কংগ্রেস থেকে তিনি কতটা জিততে পারবেন তাতে সংশয় আছে। অন্যদিকে, বিজেপি থেকে দাঁড়ালে হিন্দু ভোটের প্রায় পুরোটাই তিনি পাবেন। আর মুসলমান ভোট পুরোটাই শাসক দল নাও পেতে পারে। আর মুসলমান ভোট তিনি একেবারেই পাবেন না তাও নয়। তাঁর ব্যক্তি ভোট তো আছেই। আর এর আগেও দেখা গিয়েছে শমীকবাবু বসিরহাটে মুসলমান ভোট পেয়েছেন। তাই সব শেষ হওয়ার আগে অধীরবাবুর নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার সময় এখন চলছে। অধীরবাবু সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন এটাই কামনা করি।

—পদ্মপ্রিয় পাল,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

রাশিফল

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, স্বস্তিকায় কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রকাশিত সাপ্তাহিক রাশিফল নিয়ে কয়েকজন গ্রাহক অভিযোগ করছেন যে, স্বস্তিকা পত্রিকা চিন্তা, মনন ও সংস্কারে নৈতিকতা, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন হলেও শুধুমাত্র অনুমান নির্ভর ও প্রমাণ ছাড়াই সাপ্তাহিক রাশিফল কেন? তাহলে গতানুগতিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে স্বস্তিকাও একই পর্যায়ে পড়ে গেল না কি? রাশিফল একপ্রকার অনুমান নির্ভর। একে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে মানুষের সংস্কার, কর্মফল, পরিবেশ, কর্মপ্রচেষ্টা, সৎসঙ্গ, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার কি কোনও মূল্য থাকবে? বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে স্বস্তিকার বিষয়বস্তুর সংশোধন ও ভালো ভালো বিষয়বস্তুর সংযোজনের আবেদন জানাই।

—সোমনাথ ওঝা,
হলদিয়া, পূর্বমেদিনীপুর।

দেবীনাম চিত্তেশ্বরী কীভাবে?

উত্তর কলকাতার কাশীপুর গান ফ্যাক্টরির পাশেই রয়েছে দেবী চিত্তেশ্বরীর মন্দির। এই দেবীর প্রাচীনতা প্রায় পাঁচশো বছর। প্রাচীন নথিতে স্থানটির নাম ছিল চিত্রপুর। এখানে দেবী সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী অর্থাৎ দেবী দুর্গা। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এই দেবীর পাদদেশে একদিকে রয়েছে বাঘের মূর্তি যা মন্দির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পূজিত। এই বাঘ হচ্ছে চিত্রবাঘ বা চিতাবাঘ। এর গায়ের রঙ হলদে যার উপরে রয়েছে গোল গোল কালো ছাপ বা চিত্র। চিত্র যুক্ত বাঘের নাম হয় চিত্রবাঘ বা চিতাবাঘ। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই স্থানটি ছিল হিংস্র পশুর বাসভূমি। হিংস্রপশু বিশেষ করে চিতাবাঘের আক্রমণে প্রাণ হারাত মানুষ। সেজন্য চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেবী দুর্গার পাদদেশে স্থাপিত হয়েছিল চিতাবাঘ বা দক্ষিণরায়। দক্ষিণের রাজা সুন্দরবনে বাঘই ছিল রাজা। উল্লেখ্য, সুন্দরবন ছিল ডোরাকাটা বা ডোরা অঙ্কিত বাঘের বাসভূমি আর আলোচ্য স্থান ছিল চিতাবাঘের বাসভূমি। দেবীর পাদদেশে দক্ষিণরায় থাকার অর্থ দক্ষিণরায় দেবীর কাছে বশীভূত। দক্ষিণরায় চিত্রবাঘকে বশীভূত করার জন্য দেবীর নাম চিত্রঙ্গপুরী বা চিত্তেশ্বরী হয়ে যায়। স্থান চিৎপুর আর দেবীনামের মূলে রয়েছে চিতাবাঘ।প্রসঙ্গত, চিতে ডাকাত ও চিতে কালীর কথা বলতে হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন চিতে ডাকাত দেবী চিত্তেশ্বরী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু আমরা জানি, ডাকাতদের আরাধ্য দেবী কালী। দেবী দুর্গা নয়। দেবী দুর্গার মন্দির রাজারাজড়া বা জমিদাররা প্রতিষ্ঠা করতেন। যতদূর সম্ভব, তৎকালীন জমিদার মনোহর ঘোষ ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ঠিক, জনৈক ডাকাত সর্দার চিত্তেশ্বরী আরাধনা করতেন কালী বা দুর্গা হিসেবে। 'ডাকাতের আরাধ্য দেবী কালী হবেন'— এই ভাবনায় চিত্তেশ্বরী লোকমুখে চিতেকালী হয়ে যায় আর ডাকাত হয়ে যায় চিতেডাকাত। পরিশেষে বলতে হয়, চিতাবাঘ বশীকারিণী ঈশ্বরী হচ্ছেন চিত্তেশ্বরী।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

ভারতবর্ষ

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পত্রে ('বাংলায় শ্রীরামনবমী', স্বস্তিকা ৯.৪.১৮) সৈয়দ (sic) মুজতবা আলিকে 'ভারতবর্ষ' নামক প্রবন্ধটির লেখক বলে উল্লেখ করেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলি নয়; রচনাটির লেখক এস. ওয়াজেদ আলি। রচনাটি এককালে স্কুল-পাঠ্য ছিল। ১৯৩৯ সালে ক্লাস টেন-এ পড়বার সময় রচনাটি পড়েছিলাম। সুলেখক, প্রাবন্ধিক এস. ওয়াজেদ আলী, বি.এ. (ক্যান্টার), বার-অ্যাট-ল কিছুকাল প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটপদে আসীন ছিলেন। 'ভারতবর্ষ' নামক অপূর্ব রচনাটি তাঁর তখনকার একটি অভিজ্ঞতা কেন্দ্র করে রচিত।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

অখিলা থেকে হাদিয়া আর কতদিন ?

সুতপা বসাক ভড়

কেরলের মেয়ে অখিলার হাদিয়া হওয়ার ঘটনাটি সম্প্রতি গোটা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শফি জহাঁ নামের একটি মুসলমান যুবকের সঙ্গে অখিলার বিয়েকে লাভ-জেহাদ আখ্যা দিয়ে ওই বিয়েকে অস্বীকার করে কেরলের হাইকোর্ট। কেসটি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এলে হাদিয়া জানায় যে, সে স্বাধীনতা চায় এবং নিজের স্বামীর কাছেই যেতে চায়। মেয়েটির বক্তব্য যে, সে নিজের ইচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং আপাতত সে নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে চায়; অথচ অখিলার মা-বাবা অভিযোগ করেছেন, তাঁদের মেয়েকে ভুল বুঝিয়ে ধর্ম পরিবর্তন করানো হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য— তাঁদের মেয়ে লাভ-জিহাদের শিকার। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির মতে, তাদের কাছে প্রমাণ আছে যে শফি জহাঁ পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার মহিলা শাখাতে জিজ্ঞাসা করে যে, যদি সে ধর্ম পরিবর্তন করায় তবে কত টাকা পাবে। এর উত্তরে মহিলা শাখার কর্মরতা মহিলা জানান যে টাকা নয়, ডলার পাবে সে। এই পপুলার ফ্রন্টের সদস্য একবার এক অধ্যাপকের হাত কেটে নেয়।

অখিলার বয়ানের ভিত্তিতে ওয়েইসি, ওয়ারিশ পাঠান এবং তাদেরই মতো কিছু লোক বলতে শুরু করে যে, এন. আই. এ দেশের সুরক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ, তারা কারুর ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ, এই ধরনের লোকজন তিন-তালাকের ব্যাপারে ঘোরতর মহিলা-বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন। সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রথিতযশা উকিল জানিয়েছেন যে, হাদিয়ার (অখিলার ধর্ম পরিবর্তনের পরের নাম) মতে ইসলাম একটি অপেক্ষাকৃত ভালো ধর্ম, সেজন্যই সে এই ধর্ম বেছে নিয়েছে।

কেরলে ধর্মান্তরণ আজকের ঘটনা নয়। সুদূর অতীতে বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম-এর একজন প্রবীণ নেতা বলেছিলেন যে, মুসলমানেরা তাদের মেয়েদের ধর্মান্তরণ করিয়ে বিয়ে করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কেরলের বামপন্থী সরকার উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এন আই এ-র বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছে, অর্থাৎ এন আই এ যদি মনে করে অখিলাকে হাদিয়া বানাবার জন্য জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করে হয়েছে, তাহলে সরকারও তাই মানছে; অথচ এই সরকারই অক্টোবর মাসে এন আই এ-র রিপোর্টকে অস্বীকার করেছিল। কেরলের বামপন্থীরা জানাচ্ছেন এখানে পেট্রোডলারের প্রাচুর্যের পর থেকেই বিশাল দুর্গের মত মসজিদ তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে। কেরলে কেবলমাত্র মুসলমানেরাই নয়, খ্রিস্টানরাও হিন্দুদের ধর্ম পরিবর্তন করে চলেছে। ফলে মা-বাবারাও সদা-সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন, যাতে তাঁদের সন্তানরা ভুল করেও ধর্ম পরিবর্তনের ফাঁদে পা না দেয়। হাদিয়ার মতো ঘটনায় দেশে এত বেশি সমালোচনার ঝড় উঠেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যুবসমাজ নিজের মা-বাবাকেই স্বাধীনতা অর্জনের পথে সব থেকে বড় বাধা হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে। শুধুমাত্র ভারতেই নয়, বিশ্বেও ঘটনাটি বহুল প্রচার হয়েছে। বহু বছর আগে কেরলের বিখ্যাত লেখিকা কমলা দাস ধর্ম পরিবর্তন করে নিজের নতুন নাম নেন সুরাইয়া। মুসলমান সমাজে প্রচলিত মেয়েদের জন্য পর্দাপ্রথাকে তিনি ভালো মনে করতেন এবং বলেন যে, তাঁর ধর্ম পরিবর্তনের পর থেকে বড় বড় মুসলমান নেতা, অভিনেতা সবাই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেরলের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মেনে নেন যে, সেখানকার লোকেরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। আগে সেখানকার মহিলারা বোরখা পরত না, অথচ এখন পরছে। তামিলনাড়ুর একজন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর মাকে একজন ফকির বলেছিল যে, যদি সে ধর্ম পরিবর্তন করে, তবে তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মহিলা সপরিবারে ধর্মান্তরিত হয়ে যান।

মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত অখিলার বাবা-মা।

ধর্ম পরিবর্তন ভারতে কেবলমাত্র এখনই হচ্ছে তা নয়। ইতিহাস সাক্ষী, একসময় কাশ্মীর হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। আমাদের ভাবতে হবে যে, কেন হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হলো পরিবারে সংস্কারের অভাব, দারিদ্র্য এবং জাতপাতের সমস্যা। হিন্দুধর্ম যদি এর ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, তবে ধর্ম পরির্তন অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে। আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে অখিলাকে যদি জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করে হাদিয়া করা হয়ে থাকে, তা কেন হলো?

এর প্রতিকার কীভাবে সম্ভব? লাভ-জেহাদের ফাঁদে পড়া মেয়েদের নিজ ধর্মে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অখিলার মতো অবস্থা যেন কখনও কারও না হয়, যে মেয়ে তার মা-বাবাকেই চিনতে অস্বীকার করে!

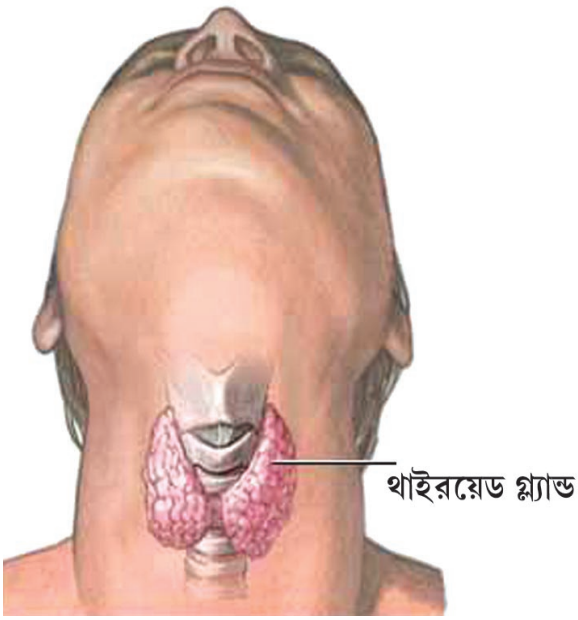

থাইরয়েড সমস্যা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ শ্রীদীপ রায়

থাইরয়েডের রোগ বর্তমানে অতি পরিচিত সমস্যা। সঠিকভাবে পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই কেউ না কেউ এই সমস্যায় ভুগছেন। প্রযুক্তি তথা প্রচার ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে থাইরয়েডের রোগ সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা সকলেরই আছে। থাইরয়েডের সমস্যা একটি হরমোন ঘটিত সমস্যা। থাইরয়েড হরমোন জন্মের আগে ভ্রূণ অবস্থা থেকে আমৃত্যু মানুষের নানা বিপাকীয় কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে হরমোনের ভারসাম্যে সামান্য ত্রুটি হলেই শারীরিক ও মানসিক একাধিক গোলযোগ দিতে আরম্ভ করে।

থাইরয়েডের সমস্যা মূলত অটো ইমিউন ডিজিজ। আয়োডিনের অভাবের কারণে থাইরয়েড হরমোন ক্ষরণের ত্রুটি দেখা দিতে পারে। এছাড়াও বর্তমানে পরিবেশ দূষণকে এই সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে। এই অসুখে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি। অটো ইমিউন থাইরয়েডিজমে মহিলারা বেশি আক্রান্ত হন। তাছাড়াও বংশগত কারণে অনেকে এই অসুখে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

থাইরয়েডের সমস্যা মূলত তিন রকমের।

(১) হাইপো থাইরয়েডিজম— থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে কম পরিমাণে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন নিঃসৃত হলে হাইপো থারিয়েডিজম রোগের সৃষ্টি হয়। এই হরমোন দেহের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে, তাই এর অভাবে বিপাক-হার কমে যায়।

লক্ষণ ঃ হঠাৎ করে শরীরের ওজন বাড়তে শুরু করে। হাত-পা, গলা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায়। স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রয়োজনীয় শক্তির অভাব দেখা দেয়। শরীরে দুর্বলতা, শীত শীত ভাব অনুভূত হয়। স্মৃতিহীনতা, অতিরিক্ত রজঃস্রাব, নানারকম মানসিক সমস্যা দেখা দেয়।

(২) হাইপার থাইরয়েডিজম— দেহে থাইরয়েড হরমোনের আধিক্য বেড়ে গেলে তখন তাকে হাইপার থারিয়েডিজম বলে। এর ফলে খাবার গ্রহণের তুলনায় বিপাকের হার বেশি হওয়ায় দেহের ওজন উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে থাকে।

লক্ষণ ঃ গরম ভাব, অল্পেই ঘাম হওয়া, মনঃসংযোগের অভাব, বেশি চঞ্চলতা, নিদ্রাহীনতা, বুক ধড়ফড় করা, মানসিক অস্বস্তি প্রভৃতি।

(৩) গলগণ্ড বা গয়টার— থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে গেলে তাকে গয়টার বা গলগণ্ড বলে। এই গলগণ্ডের সঙ্গে হাইপো থাইরয়েডিজম অথবা হাইপার থারিয়েডিজম থাকতে পারে। আবার হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিকও থাকতে পারে। যাদের গয়টার হলেও থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা স্বভাবিক থাকে তাদের ক্ষেত্রে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

লক্ষণ ঃ গলার সামনের অংশ স্ফীত হতে থাকে, ঢোক গিলতে অসুবিধা হয়, শ্বাসকষ্ট কিংবা গলার স্বর খসখসে হয়ে যায়।

ছোটোদের থাইরয়েডের সমস্যা— দেহের বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে থাইরয়েডের ভূমিকা রয়েছে। থাইরয়েড হরমোনের সমস্যায় কৈশোরে দীর্ঘায়িত বয়ঃসন্ধির এবং শারীরিক বৃদ্ধির গতি হ্রাস পায়। পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়ে ও নানারকম মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। থাইরয়েডের সমস্যায় মেয়েদের সময়ের আগে বয়ঃসন্ধির লক্ষণ দেখা দেয়। এই হরমোনের ক্ষরণ কম বা বেশি হলে মহিলাদের মেনস্টুয়েশনে প্রভাব পড়ে। গর্ভধারণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় শিশুর দেহে এই হরমোনের অভাবের ফলে শিশু জড়বুদ্ধি হতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্রে একে ক্রেটিন বলা হয়।

জটিলতা ঃ এই রোগের ফলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। রোগী কোমাতে চলে যেতে পারে। ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চিকিৎসা ঃ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় লক্ষণ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে। যেমন, ক্যালকেরিয়া কার্ব, আয়োজম, থাইরয়েডিনাম, নেট্রাম মিউর প্রভৃতি। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

(যোগাযোগ : ৯১৬৩২৬৮৬১৬)

রমজান মাসে কাশ্মীরে সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণায় জিহাদিরা সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে

প্রণব দত্ত মজুমদার

এখন মুসলমানদের পবিত্র রমজান মাস চলছে। ভারত সরকার তার গুডউইল দেখাবার জন্য এই কাশ্মীরে মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবার দাবি মেনে রমজান মাসে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করেছে। এতে কাশ্মীরে যেসব জিহাদি গোষ্ঠী সক্রিয় তারা আরও সুবিধাজনক পরিস্থিতি পেয়ে যাবে এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কাজকর্মকে গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। এটা অনেকেই জানেন যে— ইসলাম মতে, যেসব মুসলমান জিহাদের সঙ্গে যুক্ত তাদের কাছে রমজান মাসে রোজা রাখার চাইতে জিহাদ করাটা অধিকতর পুণ্যের কাজ।

আরবি মতে চান্দ্রমাস ও চান্দ্র বছর গণনা করা হয়। এই মতে নবম মাস হলো রমজান মাস। এই মাসটি মুসলমানদের কাছে খুব পবিত্র। কারণ এই মাসেই নবি মহম্মদের কাছে আসমানি কেতাব পবিত্র কোরআন শরিফ অবতীর্ণ হয়েছিল। এই রমজান মাসে মুসলমানরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা পালন করে। রমজানের আক্ষরিক অর্থ হলো পুড়িয়ে ফেলা। বলা হয় একমাস ব্যাপী রোজা পালনের মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের পাপ ও অকল্যাণ পুড়িয়ে ফেলে। রমজান মাসের রোজা পালনের এই দর্শনটাই বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার করা হয়।

একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন, ইসলামে কোরানকে হুবহু মান্য করা যেমন অবশ্য কর্তব্য তেমনি নবি মহম্মদ যা করেছেন তা অনুসরণ করা ও মান্য করাও অবশ্য কর্তব্য। যাঁরা ইতিহাস চর্চা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, নবি মহম্মদ নিজেই ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের পবিত্র রমজান মাসে অর্থাৎ হিজরির ২য় বছরের ১৮ তারিখে রমজান মাসে মদিনা থেকে ৩০ মাইল এবং মক্কা থেকে ১২০ মাইল দূরে বদর নামক প্রান্তরে মক্কার পৌত্তলিক কোরেশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং কোরেশদের রক্তে রঞ্জিত করেছিলেন বদর প্রান্তর। বস্তুতপক্ষে বদরের যুদ্ধ জয়ই ইসলাম প্রবর্তনের মাইলফলক। এই যুদ্ধে মহম্মদ সাহেব পরাজিত ও নিহত হলে ইসলামের প্রবর্তনই হতো না। ইতিহাস থেকে জানা যায়, আরবে ইসলাম প্রবর্তনের আগে থেকেই সেখানকার মানুষের মধ্যে রমজান মাসে রোজা পালনের রীতি ছিল। এই সময় তারা যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকত। কিন্তু নবি মহম্মদ নিজেই এই রীতি ভঙ্গ করেন। কারণ সেই সময় মক্কার পৌত্তলিক কোরেশদের নেতা আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রভূত ধনসম্পদ নিয়ে বিরাট বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মক্কায় ফিরছিলেন। রমজান মাসে রোজা রেখে মহম্মদ তাদের ধ্বংস করার এই সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাননি। বদর প্রান্তরে সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ করে পরাজিত করে নবি মহম্মদের জেহাদি বাহিনী। রোজা রাখা দুর্বল লোকজন নিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই নবি মহম্মদ নিজে রোজা ভঙ্গ করেন এবং তাঁর অনুগামীদের বলেন— জিহাদের সময় আল্লা রোজা মাফ করে দিয়েছেন। কোরান বলছে— 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লা ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লার পথে জিহাদ কর। ইহাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। আল্লা তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের জান্নাতে দাখিল করবেন। ইহাই মহাসাফল্য (কোরান-৬১/১১-১২) 'তোমরা জিহাদ করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়'। (ঐ ৮/৩৯)। পৃথিবীতে বোধহয় মহম্মদই একমাত্র প্রফেট যিনি এক হাতে কোরান আর এক হাতে তলোয়ার নিয়ে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছেন।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট পবিত্র রমজান মাসেই মুসলমানরা ঘটিয়েছিল 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'। মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ পাকিস্তান দাবির পক্ষে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে মুসলিম লিগ প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দুকে হত্যা করেছিল পবিত্র রমজান মাসেই। হিন্দুদের ঘরবাড়ি দোকানপাট লুটপাট করে আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বহু রমণীর শ্লীলতাহানি করেছিল। রমজান মাসের পবিত্রতার কথা তারা মনে রাখেনি। বস্তুতপক্ষে পবিত্র রমজান মাসে জিহাদ করলে সাফল্য পাওয়া যাবে এটা জিহাদিরা বিশ্বাস করে। কারণ নবিসাহেব নিজেই রমজান মাসে বদরে যুদ্ধ করে অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

এই দৃষ্টিতে কাশ্মীরের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। জিহাদিরা যতদিন পর্যন্ত না কাশ্মীরকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করবে ততদিন তারা কোরানের নির্দেশ মেনে যুদ্ধ চালিয়েই যাবে। ভারত সরকারের কাজ হবে জিহাদিদের যত দ্রুত সম্ভব ধ্বংস করা। কোনওরকম নরম মনোভাব দেখালে চলবে না। এই পটভূমিকা মাথায় রেখে সিদ্ধান্তে আসা যায়, রমজান মাসে কাশ্মীরে সংঘর্ষ বিরতি বলবৎ করে ভারত সরকার আসলে জিহাদিদের সুবিধাই করে দিয়েছে। ইসলাম সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার কারণেই আমরা বার বার ভুল করি এবং তার ফল ভোগ করি। প্রখ্যাত ভারতীয় চিন্তাবিদ সীতারাম গোয়েল বলেছেন,— 'কোরানের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্পর্কে অমুসলমানদের অজ্ঞতাই ইসলামের শক্তির কারণ।' পৃথিবীর প্রায় ৫৬টা দেশে এভাবেই ইসলামের প্রবর্তন হয়েছে।

ইমানদারির রমজান মাসে পাকিস্তানের বেইমানি

চন্দ্রভানু ঘোষাল

রিয়াজুদ্দিন বেগ জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলার বাসিন্দা। নিষ্ঠাবান মুসলমান। পাঁচ ওয়ক্ত নমাজ পড়েন। অশীতিপর মানুষটি বাড়ির দেওয়ালে স্প্লিন্টারের দাগগুলো দেখিয়ে বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'ওয়হ্ মুলক (পাকিস্তান) বিলকুল খোকলা হো গয়া। ইসি লিয়ে রমজান পর ভি হামলা কর দিয়া।'

ইসলামি পঞ্জিকায় রমজানকে পবিত্র মাস মানা হয়। এই সময় মুসলমানরা রোজা রাখেন। অর্থাৎ সারাদিন নির্জলা উপবাস করে সূর্যাস্তের পর ফল-টল খান। রিয়াজুদ্দিনের ভাষায়, 'রমজান মাহিনে মেঁ কিসি পর-হামলা করনা, চাহে ওয়হ্ কোই ইনসান হো ইয়া মুলক্, মজহব কি খিলাফ হ্যায়।

রিয়াজুদ্দিনের কথাগুলো একজন মুসলমানের কথা। সমস্যা হলো সারা বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান সেই কথাগুলোই বলেন যা তাদের শেখানো হয়। অর্থাৎ ইসলাম পরম শান্তির ধর্ম, খুনোখুনি সন্ত্রাস এসব ইসলাম সমর্থন করে না, লাদেন, দাউদ, হাফিজ সইদরা সন্ত্রাসবাদী এবং সন্ত্রাসের কোনও রং হয় না ইত্যাদি। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলবে। সৃষ্টিলগ্ন থেকেই ইসলাম প্রভুত্বকামী। সারা পৃথিবীর প্রতিটি কোণ নিজের দখলে নেবার জন্য নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন। রিয়াজুদ্দিন যতই রমজানে মাসে মুসলমানি 'ইমান' রক্ষার কথা বলুন, ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে কখনও ক্ষমতার জন্য, কখনও স্রেফ জমি দখলের জন্য আবার কখনও কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য মুসলমানরা বারবার বিশ্বাসঘাতকতা (বেইমানি) করেছে। মিরজাফর, অওরঙ্গজেব, শাহজাহানরা তো ছিলই, হাল আমলে জিন্না, সুরাওয়ার্দি এবং জাকির নায়েকরাও এসেছে। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন পাকিস্তান।

পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকতার নজির একটা নয়। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর থেকে পাকিস্তান একাধিকবার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্তান যা করেছে তার তুলনা মেলা ভার। মাসখানেক আগের ঘটনা। বিএসএফের হাতে প্রবল মার খেয়ে বিপর্যস্ত পাকিস্তান ভারতের কাছে 'রিটালিয়েশন' (সামরিক পরিভাষায় পাল্টা মার) বন্ধ করার আরজি জানিয়েছিল। সেই আরজির ওপর ভিত্তি করে ভারত শর্তসাপেক্ষে সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত নেয়। এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমালোচিত হন। জবাবে তিনি রমজান মাসের পবিত্রতার কথা বলেন। আরও জানান, ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ধর্মাচরণে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তাই এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভারতের এই উদারতার জবাব পাকিস্তান দিল অন্যভাবে। সংঘর্ষ বিরতির সুযোগে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর জম্মুর বিভিন্ন অসামরিক অঞ্চলে নির্বিচার বোমাবর্ষণ করে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত এই হামলায় ১২ জন মারা গেছে। যার মধ্যে রয়েছে একটি আট মাসের শিশুও।

ভয়াবহ অবস্থা জম্মুর কয়েকটি অঞ্চলে। জোরাফার্মের কথাই ধরা যাক। জোরাফার্মকে পুরোপুরি গ্রাম বলা যাবে না। ইংরেজিতে একে বলে হ্যামলেট। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী, গ্রামের থেকেও ছোট মনুষ্য বাসভূমি। রমজান মাসে ব্রাহ্মমুহূর্তের জলখাবারকে শেহ্রি বলে। জোরাফার্মে পাকিস্তান যেদিন মর্টার-তাণ্ডব চালায় সেদিন এখানকার মানুষ আর খাবার (শেহ্রি) মুখে তুলতে পারেননি। তার আগেই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল ছোট্ট এক চিলতে গ্রামটা।

জালান দিন গুজ্জর জোরাফার্মের বাসিন্দা। তিনি বলেন, 'শেহ্রির কথা কী বলছেন! আমরা যে এখনও বেঁচে আছি তার কারণ রাতের অন্ধকার থাকতেই আমরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। শেহ্রির সময় যখন হলো আমরা দেখলাম পাকিস্তানের গোলায় গোটা গ্রাম ধুলোয় মিশে গেল।' জোরাফার্ম সাধারণভাবে দুধের ব্যবসায়ীদের গ্রাম। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ দুগ্ধ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। মুসলমানরা যতই মুখে বলুন তাদের সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা নেই, গুজ্জররা কিন্তু বংশানুক্রমিক ভাবে (যাদব বা গয়লাদের মতো) দুধের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। জালান দিন গুজ্জরও কথাটা মানেন। তাঁর আক্ষেপ, 'গুজ্জরদের ধনেপ্রাণে মারার জন্যই পাকিস্তান বারবার এই গ্রামে হামলা করে। এই নিয়ে চারবার হলো।'

এখন যদি কেউ জোরাফার্মে যান, কাউকে দেখতে পাবেন না। সবাই আশ্রয় নিয়েছেন একটি সরকারি বাড়িতে। প্রতিটি চোখে মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখার আতঙ্ক। সেই

পাকিস্তানের আক্রমণ থেকে বাঁচতে বাঙ্কারে আশ্রয়।

সঙ্গে বিস্ময়ও। ইসলামি দেশ হয়ে পাকিস্তান কীভাবে রমজান মাসে বেইমানি করল। ভারত তো সংঘর্ষ বিরতির কথা ঘোষণা করেছিল। হিন্দুদের দেশ হয়ে ভারত রমজান মাসের মাহাত্ম্য বুঝল, আর পাকিস্তান বুঝল না!

বস্তুত শুধু জোরাফার্ম নয়, জম্মু, কাঠুয়া, সাম্বা জেলার অন্তত একশোটি গ্রামের মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় শিবিরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এক পুলিশ অফিসার জানালেন, 'পাকিস্তানের রেঞ্জাররা আক্রমণের জন্য সাধারণ গ্রামগুলোকে বেছে নিয়েছিল। গভীর রাতে হামলা চালানো হয়। মূলত মর্টার এবং ভারী রাইফেল ব্যবহার করা হয়।'

তবে এখানকার মানুষের ভাগ্য ভালো, কারণ জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ অসাধারণ কাজ করেছে। জম্মুর ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এস ডি সিংহ জামওয়াল বলেন, 'উপদ্রুত অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তরিত করে।' জম্মুর বিভাগীয় কমিশনার হেমন্ত কুমার শর্মা বলেন, 'আশ্রয় শিবিরগুলিকে সক্রিয় করে তোলা হয়েছে। বিশেষ করে কাঠুয়া এবং সাম্বা জেলায়। মূলত স্কুল কলেজগুলিতেই আশ্রয় শিবির করা হয়েছে।' বিভাগীয় কমিশনার আরও জানিয়েছেন আশ্রয় শিবিরে পর্যাপ্ত সুবিধা রয়েছে। যেসব স্কুলবাড়ি পাকিস্তানি বোমায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত সেগুলি আপাতত বন্ধ। তবুও এরই মধ্যে জীবন আবার তার সঞ্জীবনী প্রলেপ বিছিয়ে দিয়েছে। কাঠুয়া গ্রামের ছন্দা দেবী। বোমার স্প্লিন্টারে মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। এখন কিছুটা সুস্থ। হাঁটু পর্যন্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা পা ছড়িয়ে বসে বলেন, শিউজী কা কিরপা সে সব ঠিক হো যায়েগা বেটা। লেকিন পাকিস্তানকো সবক শিখানা পড়ে গা। নেহি তো ওয়হ্ বারবার অ্যায়সে হামলে করতে রহেঙ্গে।'

পাকিস্তানকে সবক শেখাতে হবে। মোটামুটি সমগ্র জম্মুতে এখন একটাই দাবি। জম্মু হিন্দুপ্রধান অঞ্চল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এখানে অনেকেই ত্রাতা হিসেবে দেখেন। এক কিশোরের মোবাইলে ডাউনলোড করা একটি ভিডিও ক্লিপিং দেখা গেল। সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এক পড়োশি দেশ পিঠ পিছে ছোরা ভোগত্যা হ্যায়। লেকিন মোদী ছোড়েগা নেহি।' ছেলেটি সবাইকে ওই ভিডিও দেখাচ্ছে। ওর সরল হাসিতে ঝরে পড়ছে আত্মবিশ্বাস। যেন সে এই বিপর্যয়ে একা নয়। কেউ একজন আছেন। যিনি ঠিক সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়াবেন।

রিয়াজুদ্দিন বেগও কি বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানকে সবক শেখাতে চান? চান তো অবশ্যই, কিন্তু একটু অন্যভাবে। —'দেখিয়ে জনাব, ইনসানিয়ত কে খাতির ইয়ে সব বনধ হোনা চাহিয়ে। নেহি তো একদিন ইসলাম খতম হো যায়েগা।' লম্বা দাড়িতে হাত বুলিয়ে কথা বলেন রিয়াজুদ্দিন। কথা বলার সময় হলদেটে চোখে এক অদ্ভুত ঝাপসা ছায়া ফুটে ওঠে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি মুসলমানই থেকে যান। পাকিস্তানের বেইমানি তার কাছে ইসলামির চ্যুতি। পাকিস্তান কোনওদিনই তার কাছে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ধরা দেয় না। সম্ভবত কোনওদিন দেবেও না। কারণ সেটাই ইসলামি শিক্ষা।

এই শিক্ষার গুণেই সারা পৃথিবীকে রক্তে স্নান করিয়েও একজন মুসলমানের কাছে ইসলাম শুদ্ধ থেকে যায়। অন্যদিকে, অন্য ধর্মের মানুষেরা চিরকাল চিহ্নিত হন কাফের বলে।

ভারতে রিয়াজুদ্দিনরাও থাকবেন আবার ওই কিশোররাও থাকবে। নিঃসন্দেহে ওই কিশোরই ভারতের ভবিষ্যৎ। যে ভবিষ্যৎ পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে চায়। সারা ভারতই এখন কাশ্মীর সমস্যার সমাধান চাইছে। তাদের আশা নেহরুর তৈরি করা সমস্যার সমাধান করবেন নরেন্দ্র মোদী। সীমান্তে বন্ধ হবে গোলাগুলি। জোরাফার্মের দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে আবার শোনা যাবে ভেড়ার ডাক। অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের কোনও তফাতই থাকবে না। ▮

বিধ্বস্ত জোরাফার্ম গ্রাম।

নেভা থেকে মস্কোভা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সুযোগ এসে গেল হঠাৎ রাশিয়া ভ্রমণের। ছাড়া যায়নি। তিনটি এয়ারপোর্ট ঘোরার কষ্ট সামলাতে পারলে ২৪ ঘণ্টার একটানা সফরে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শহর সেন্ট পিটার্সবার্গে পৌঁছনো যায়। সেইভাবেই পৌঁছেছিলাম, সঙ্গে তিন বছরের শিশুও ছিল। একবার গিয়ে পড়তে পারলে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন অপরূপ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হয়ে থাকা প্রায় একই উচ্চতার প্রাসাদোপম হর্ম্যমালার দিকে তাকালে পথশ্রমের সমস্ত ক্লান্তি নিমেষে কর্পূর হয়ে যাবে।

এই ঐতিহাসিক নগরী মূলত নির্মিত হয়েছিল রাশিয়ার জারদের সমৃদ্ধির আমলে। বিপ্লবের আগে (১৯১৭) পর্যন্ত এটিই ছিল রাজধানী শহর। মস্কো থেকে দূরত্ব কম বেশি ৭০০ কিলোমিটার। পৌঁছে রেডিসন আন্তর্জাতিক হোটেল চেনের অধীনে পার্কইনে আস্তানা ঠিক ছিল। ৮ তারিখে বেরিয়ে ইতিমধ্যে ৯ মে হয়ে গেছে। ঘড়ি ঠিক করার পর মালপত্র রেখে আবার রাশিয়ার সময় সন্ধ্যে ৭ টায় বেরোন। আমাদের থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা পিছিয়ে। বালটিক সাগর থেকে বেরিয়ে আসা নেভা নদীর জলকে নিয়ন্ত্রণ করে মনোরম সব ক্যানেল তৈরি করা হয়েছে। এরই ওপর সারা বিশ্বের অবাক দৃষ্টির পর্যটকদের নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে অজস্র মোটর বোট। এই নেভা নদীর পাড়েই একসময় হয়েছিল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। আজ উজ্জ্বল সূর্যালোকে শুধুই নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা নয়নাভিরাম সব বসত বা কেজো বাড়ি। বোট থেকেই দেখা যাচ্ছে সংলগ্ন পথের দৃশ্য। রাস্তাগুলি কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া মূলত জনবিরল। বোটের মধ্যে খাদ্য-পানীয়ের (শক্ত ও তরল) সব রকম ব্যবস্থাই ছিল। এমন নৈসর্গিক দৃশ্য ও তরলের গুণে আমাদের সঙ্গী জনাকয়েক বেরিলিবাসী সহযাত্রী মানে ক্রমে বেহেড হয়ে পড়লেন। দেড় ঘণ্টার যাত্রার ভাড়া ৯০০ রুবল ১১০০ টাকা। শেষ হতে হতে রাত ৯টা। তবে রাত বলা যাবে না। মে-জুন মাসে এখানে বিলেতের মতোই ১০টা অবধি অস্তরাগ থেকে যায়। আমরা হোটেলে ফিরলাম সাড়ে ৯টায়। পরের দিন শহর ভ্রমণের প্রথম গন্তব্য 'সেন্ট আইজ্যাক ক্যাথিড্রেল'। এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ ও রাশিয়ার সর্ব বৃহৎ অর্থডক্স চার্চ। গাইড বোঝালেন নিও ক্লাসিকাল ও বাইজেনটাইন স্থাপত্য রীতির এই উপাসনালয়ে ১৫০০০ হাজার মানুষ একত্রে প্রার্থনা করতে পারেন। ঢোকার খরচ ৩০০ টাকা। এখানেই রয়েছে পৃথিবীখ্যাত ব্রোঞ্জ হর্সম্যান। সেন্ট পিটার্সবার্গ একটি ধর্মপ্রাণ শহর। ৫০ লক্ষ লোকের জন্য ১৩৭ টি চার্চ আছে। আমাদের দেশে মন্দির দেখলে কপালে হাত ঠেকানোর মতো চার্চ দেখলেই এরাও আমেন করেছে। এটি লেনিন, স্তালিনের এমন আদ্যপান্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী শহরে বিপ্লব ঘটানোর চমকের মতো কয়েক দশকেই তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার অকাট্য প্রমাণ। শহরটি অর্থডক্স থেকে লুথেরান, ক্যাথলিক, মেথডিস্ট সব মতাবলম্বীর চার্চে ভরা। একটু পিছিয়ে বলি ৯ মে, দিনটি দুপুরের দিকে গড়িয়ে পড়তেই ভ্রমণ বাস থেকে দেখলাম কাতারে কাতারে নরনারী, ছেলে বুড়ো কেউ রক্ত পতাকা, কেউ সাদা প্ল্যাকার্ডে ছবি সেঁটে শহরের মূল বড় রাস্তা ছেড়ে কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউর চেয়ে বড় পার্শ্ববর্তী রাস্তাগুলি পরিক্রমা করছে। জানলাম ওইদিন সব চেয়ে বড় ছুটির দিন। বিজয় দিবস। ১৯৪৫ সালে জার্মানি এদিনই আত্মসমর্পণ করেছিল। ওই প্ল্যাকার্ডগুলিতে ছিল পরিবারের যিনি যুদ্ধে মারা গিয়েছেন বা গুরুতর আহত হয়েছিলেন তাঁদের ছবি। হতবাক হয়ে দেখতে হয় শতকরা ৮০ জনের হাতেই ছিল স্বজনের স্মৃতি চিহ্ন।

এই সেন্ট পিটার্সবার্গের নামই বিপ্লবোত্তর কালে লেনিনগ্রাদ হয়। ১৯৪১-এ হিটলার ৯০০ দিন এই শহর অবরোধ করে ৭৫ হাজার বোমা ছুঁড়ে ছিলেন। অবর্ণনীয় সেই দুর্দশা সামলাতে মারা গিয়েছিলেন ৮ লক্ষ শহরবাসী। সৈন্যবাহিনী তো আলাদা। এই মিছিল ছিল তাঁদেরই উত্তরাধিকারীদের, এটি বাড়তি পাওনা।

এরপর অভিজ্ঞতা বাড়াতে ১০ তারিখে রুশি হোটেলে খেতে ঢুকে অর্ডার দিলাম ২০ টুকরো ভিন্ন স্বাদের মুর্গির মোমো। এর পরই পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, রাশিয়ার সব চেয়ে বড়। এখানে তুলনামূলক কম খরচে অনেক বিদেশিরা পড়াশোনা করেন। বিশাল সেই চত্বর। আশেপাশেই আসন্ন ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের নির্মাণকার্য চলছে। এখানে মূলত জাহাজ শিল্পের খুব বাড়বাড়ন্ত। চাকরি সেখানেই। পেট ভরিয়েই ৩০ লক্ষ শিল্প সম্ভারে ভরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নন্দন সৌকার্যের সংগ্রহালয় Hermitage Museums। ১৭৬৪ সালে সাম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন দ্য গ্রেট এটি নির্মাণ করান। এরই সঙ্গে অবস্থিত জারদের বাসস্থান বিখ্যাত উইন্টার প্যালেস যেখান থেকে ১৯১৭-য় বিপ্লবী বলশেভিকদের হাতে বন্দি হওয়ার পর তাঁরা নিহত হন। এই মিউজিয়াম দেখতে দেখতে গাইড বললেন পুরোটা দেখতে ১ মাস লাগবে, কেননা এই প্রাসাদে ১৭৮৬ দরজা, ১৯৪৫ জানালা, ১৫০০ ঘর ও ১১৭টি সিঁড়ি আছে। কেবল দ্য ভিঞ্চি, রেমব্রান্ট, রাফেলের নামের ওজনে ভরা কিছু প্রামাণিক চিত্র ও অন্যান্য মণিরত্ন দেখতেই সময় শেষ হয়ে গেল। মিউজিয়ামে লোকের সমাগম দেখলে তাক লেগে যাবে।

পরেরদিন সকালে ফ্রি চর্বচোষ্য প্রাতঃরাশের পর ১টায় দ্রুতগামী ট্রেনে মস্কো যাত্রা। ৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ১৭০ কিলোমিটার বেগে বিরামহীন মাঠ-ঘাট, বনপথের গ্রামীণ রাশিয়া ভেঙে চলা। সহযাত্রী এক নিরাপত্তা বাহিনীর লোককে খুব কষ্ট করে ইংরেজি বলিয়ে (এরা ইংরেজি মোটেই জানে না লিখতেও চায় না এদের জাত্যাভিমান প্রবল) জানা গেল ট্রেনের যাত্রা পথের গ্রামীণ অঞ্চলগুলি সবই জার্মান অবরোধাক্রান্ত ছিল। ৫-৩০ মস্কো পৌঁছেই ওখানকার মেট্রো (১৯৩৪) ধরা। অসম্ভব কারুকার্যময়, প্রাচীন ধ্রুপদী ধারায় স্টেশনগুলি নির্মিত। কোথাও ঝাড়লণ্ঠন, কোথাও রামধনু রঙের পুরনো কাঁচের পার্টিশান। ১৩টি দিকে ধাবমান এই পুরোপুরি ভূগর্ভস্থ মেট্রোতেই রয়েছে প্রাণচাঞ্চল্য ও কিছুটা ভিড়। তবে কোনও হৈ-হট্টগোল নেই। লাইন পালটে পালটে রেড স্কোয়ার আর দাদাদের পিতৃভূমির শ্রেষ্ঠতীর্থ ক্রেমলিন। রাস্তায় কিন্তু প্রস্রাবাগার কম।

ক্রেমলিনের সামনে লেখক।

এখানে সামনেই আছে বিশ্বখ্যাত বাজার। হারিয়ে যাওয়ার মতো চত্বর। আমরা ছাগ শিশুর মতো পথ প্রদর্শকের অনুসরণে ছিলাম। ৯টায় হোটেলে। একটু বেলা হলে মস্কো দর্শন। এগোতেই মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট পেরোতে না পেরোতেই গা ছমছমে কালাশনিকভ বিল্ডিং বাপরে, গাড়ি স্পিড নিল। আশপাশ দিয়ে দ্রুত গতিতে প্রায় যাত্রীহীন, কন্ডাক্টরহীন ট্রাম চলেছে। বাস কম। পাশেই বহতা মস্কোভা নদী। সব লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ গাড়ি। হর্ন বিহীন। হোটেলের পাশেই শাকসবজি, মাংসের বাজার ছিল। দাম আমাদেরই দেশের মতো। আমাদের মস্কো বাসের চালক তরুণ নীলভস্কিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাদের কেউ ইংরেজি কেন বল না। তার মনে ক্ষোভ ছিল। বলল, আমরা তো জানতে চাই। এই ওয়ার্ল্ড কাপ উপলক্ষে ১০ হাজার লোক নেবে। আমি চেষ্টা করব। বাবা মা চায় না। টিভি যা বলে সবই সরকারি, ওঁরা তা দেখেই মত ঠিক করেন। তবে মস্কো শহরের প্রশস্ত বৃক্ষশোভিত উদ্যানগুলি তার গর্ব হতেই পারে। মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ওপর গুরুত্ব নিশ্চিত আছে। যানবাহন সবই সরকারি। ক্রাইস্ট দ্য সেভিয়ারের বিশাল ক্যাথিড্রাল দেখে যা না দেখলেই নয় সেই রাশিয়ান সার্কাস দেখতে ঢোকা। তবে তাঁবু ফেলা নয়, ঠিক থিয়েটার বা বড় প্রেক্ষাগৃহের আবহ। দক্ষিণা ২ হাজার টাকা।

মস্কোর হোটেলে প্রাতঃরাশে ভারতীয়দের জন্য কিছুটা পাতালে 'ভোলগা ব্লক' আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়াতে কিন্তু হোয়াইট রাশিয়া আর এশিয়াটিক রাশিয়ার তফাত এ থেকেই বোঝা যায়। কুছ কুছ জরুর হ্যায়। এর পর বাজার করার ছাড়। রাশিয়ায় সব চেয়ে সস্তা সুস্বাদু চকোলেট আর ভোদকা। আত্মীয়স্বজনের জন্য প্রথমটি এক আজেরবাইজানির দোকান থেকে কিনে সোজা রাশিয়ান ব্যালে। না গেলে আগ্রা গিয়ে তাজমহল ছেড়ে আসা। প্রণামী ২৫০০ টাকা। পরদিন ১৪/৫ সকালে বিবিধ নিরীক্ষণ পার হয়ে ক্রেমলিনের অন্তঃপুর। গাইড দেখালেন রুশ রাষ্ট্রপ্রধান ভ্লাদিমির পুতিনের দপ্তর। আমরা বাইরে এলাম। তখন সকাল ১১টা। তিনি হয়তো ভেতরে বিশ্বশান্তি রক্ষার ভাবনায় মগ্ন। ফটো তুলে, বেলা ২টোয় ফিরে পেট পুজো। ৭টায় মস্কো-দিল্লি-কলকাতা বায়ুযান।

এই সময়

চার বছরে

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার চার বছর পূর্ণ করল। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

মানুষকে সুশাসনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক বিকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সরকারের চতুর্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিজেপি পনেরো দিনের বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে।

নিপার জন্য

নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে। তাই বিহার সরকার রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালকে

সতর্ক করেছে। সজাগ সিকিমও। এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, নিপার সংক্রমণের লক্ষণ হলো জ্বর, মাথাব্যথা,বমি ও অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। চিকিৎসা সেই অর্থে নেই। গাছ থেকে পড়া ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। এই ভাইরাসের বাহক শুয়োর ও বাদুর।

কেদারনাথ দর্শনে

কেদারনাথ মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের ঢল নেমেছে। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, এবারের

মরশুমের প্রথম ২৬দিনেই গতবারের তুলনায় ১লক্ষ বেশি তীর্থযাত্রী কেদারনাথ দর্শন করেছেন। জেলাশাসক মঙ্গেশ ঘিলাদয়াল বিপুল যাত্রী সমাগমের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ দেন।

সমাবেশ -সমাচার

দক্ষিণবঙ্গে তাঁতিবেড়িয়ায় সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এই শিক্ষাবর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এসে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে শৃঙ্খলার পরিচয় পেলাম, তাতে আমি খুশি। যে সমস্ত অধিকারী রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

গত ২৬ মে হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়ায় সারদা শিশুমন্দিরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ছাত্রদের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও আই আই ই এস টি শিবপুরের অধ্যাপক

অভিজিৎ চক্রবর্তী এই কথাগুলি দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। স্বয়ংসেবকদের হাতের

লাঠি নিয়ে তিনি মন্তব্য করেন— 'তোমাদের মনোবল লাঠির মতো ঋজু ও দৃঢ় হোক। এখন দরকার আত্মত্যাগের মাধ্যমে এক সুদূরপ্রসারী আত্মবিশ্বাসী ভারতবর্ষের। বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতি তোমাদেরকেও বিভ্রান্ত করছে। একে প্রতিরোধ করতে হবে। নোংরামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, নইলে সমাজ, সংসার, দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা দরকার। তোমাদের ভেতর থেকেই দেশ প্রকৃত শক্তি পেতে পারে।'

সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ ও সঙ্ঘের দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতা ভাগ সঙ্ঘচালক প্রশান্ত চৌধুরী। তিনি তাঁর ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রানি রাসমণি, সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, হিন্দুত্বকে মুছে দিলে ভারতবর্ষের মৃত্যু হবে। ভারতবর্ষের মৃত্যু হলে মানব সভ্যতার মৃত্যু হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মানব সংস্কারে বিশ্বাসী। সংস্কার নির্মাণ ও সংগঠনই তার লক্ষ্য। সঙ্ঘ অন্য কিছু করবে না। স্বয়ংসেবকেরা ভালো সব কিছু করবে। প্রায় এক হাজার সঙ্ঘ-শুভানুধ্যায়ীর সামনে স্বয়ংসেবকরা বিভিন্ন শারীরিক কলাকৌশল প্রদর্শন করেন।

এই সময়

তিরন্দাজিতে পদক

বিশ্ব তিরন্দাজির দুটি পদক ভারত জিতে নিল। এই আসর বসেছে তুরস্কের আন্তালিয়ায়।

ভারতের মহিলা দল, জ্যোতি ভেনাম মুসকান কিরার এবং দিব্যা দয়াল চীনা তাইপের কাছে হেরে রুপো জেতেন। অন্য একটি পর্বে জ্যোতি এবং অভিষেক ব্রোঞ্জ পদক পান।

লস্করনামা

শেখ আব্দুল নইম। সে ছিল ভারতে লস্কর-ই-তইবার ক্যাশিয়ার। সংযুক্ত আরব

আমিরশাহি এবং পাকিস্তান থেকে তার কাছেই আসত কোটি কোটি টাকা। উদ্দেশ্য, ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রসার। সম্প্রতি এন আই এ তার বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন করেছে।

রাঁধুনি গ্রেপ্তার

উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড় থেকে উত্তরপ্রদেশের অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, রমেশ সিংহ নামের এই ব্যক্তি পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আইয়ের এজেন্ট ছিল। পাকিস্তানে নিযুক্ত এক ভারতীয় রাজদূতের বাড়িতে রাঁধুনির কজে করত।

ঊনিশে আবার মোদী

দু-হাজার ঊনিশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? দেশের ৭১.৯ শতাংশ মানুষের উত্তর— নরেন্দ্র মোদী। ইংরেজি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া সম্প্রতি একটি সমীক্ষা

করেছে। তাতেই মিলেছে এই তথ্য। সমীক্ষার আরও কয়েকটি প্রশ্ন এরকম— (১) মোদী সরকারের কাজকর্মকে আপনারা কী বলবেন? ৪৭.৪৭ শতাংশ মানুষ বলেছেন খুব ভালো। (২) মোদী সরকারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কোনটি? জি এস টির পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৩৩.৪২ শতাংশ মানুষ। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ১৯.৮৯ শতাংশ। নোট বাতিল ২১.৯০ শতাংশ। (৩) মোদী সরকারের শাসনে সংখ্যালঘুরা কি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন? ৫৯.৪১ শতাংশ মানুষ বলছেন — না। 'হ্যাঁ' বলেছেন ৩০.০১ শতাংশ মানুষ। বিদেশ নীতির প্রসঙ্গে ৬২.৬৩ শতাংশ মানুষ বলেছেন মোদী সরকার অসাধারণ কাজ করেছে। ৫৭.৬৩ শতাংশ মানুষ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধী জোট হলেও ঊনিশের লোকসভা নির্বাচনে তাদের জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই। জিতবে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন।

প্রাক্তনের কবুল

পাক সেনাবাহিনী প্রাক্তন আই এস আই প্রধান জেনারেল আসাদ দুরানির বিরুদ্ধে সমন পাঠিয়েছে। তাঁর সদ্য প্রকাশিত বই 'দ্য স্পাই ক্রনিকল'-এর জন্য এই সমন। বইটি

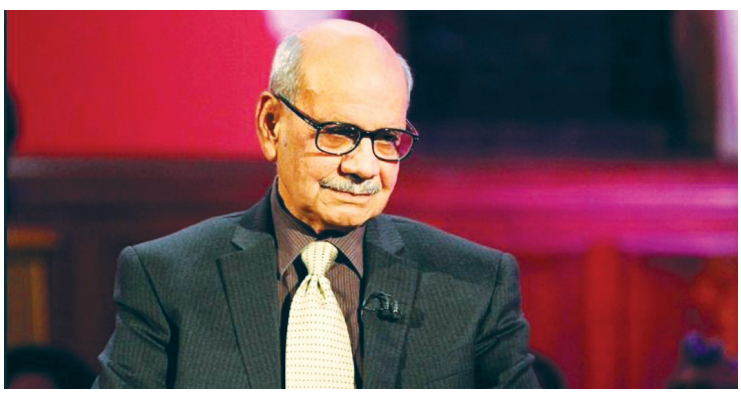

তিনি 'র'-এর প্রাক্তন প্রধান এ এস দুলাটের সহযোগে লিখেছেন। বইটির বিষয়বস্তু ভারত-পাক সম্পর্ক এবং কাশ্মীর। গ্রন্থে প্রাক্তন আই এস আই প্রধান স্বীকার করেছেন, হুরিয়ত পাকিস্তানের সৃষ্টি। তিনি লিখেছেন, পাকিস্তান গোড়া থেকেই জানত, লাদেনকে

এই সময়

নির্দোষ

কর্ণাটকের সদ্য ক্ষমতায় আসা মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বমীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। এই নিয়ে বিতর্ক সৃস্টি হয় সারা দেশে। সম্প্রতি অন্ধ্রের অর্থমন্ত্রী রামকৃষ্ণনুডু বিতর্কের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানে গেলেও চন্দ্রবাবু কোনও রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ নেননি।

বহতা সরস্বতী

বেদবর্ণিত সরস্বতী নদী আবার বয়ে চলবে। সম্প্রতি হরিয়ানার মন্ত্রী শ্রীমতী কবিতা জৈন একথা বলেছেন। হরিয়ানায় ক্ষমতায় আসার

পর থেকে বিজেপি সরকার অন্তঃসলিলা সরস্বতীকে আবার মাটির বুকে ফিরিয়ে আনতে নিরলস প্রয়াস করছে। সেই চেষ্টার ফল মিলবে এবার।

বন্ধ সীমান্ত

কবে সিল করা হবে অসম-বাংলাদেশ সীমান্ত? প্রশ্ন উঠছিল বিভিন্ন মহলে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন

চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে অসম-বাংলাদেশ সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হবে।

হত্যা করবে আমেরিকা। কবে কোথায় কীভাবে করা হবে তাও কারোর অজানা ছিল না। কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে যে পাকিস্তান দুর্ব্যবহার করেছে তাও মেনে নিয়েছেন দুরানি। তার মতে, হুরিয়তকে কাশ্মীরে রাজনৈতিক সংগঠন বলে চালানো হয়। আসলে আই এস আই নিজের গরজেই হুরিয়তকে সৃষ্টি করেছে।

বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণ মামলা

বুদ্ধগয়ায় সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণে অভিযুক্ত পাঁচজনকেই দোষী সাব্যস্ত করল এন আই এ-র বিশেষ আদালত। হায়দার আলি ওরফে ব্ল্যাক বিউটি, ইমতিয়াজ আনসারি, উমর সিদ্দিকি, আজহারুদ্দিন কুরেশি এবং মুজিবুল্লাহ আনসারির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এরা ২০১৩ সালে বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধমন্দিরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। তথ্য প্রমাণাদি বিচার করে বিচারক মনোজ কুমার এদের দোষী সাব্যস্ত করেন। উল্লেখ্য, বিস্ফোরণ হয়েছিল

সকালে, প্রার্থনার সময়। এই ঘটনায় একজন তিব্বতি সন্ন্যাসী এবং একজন পর্যটক আহত হন। এটাই ছিল বিহারে প্রথম জঙ্গি হামলা। বোধিবৃক্ষের কাছেও একটি বোমা রাখা হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত সেটি ফাটেনি। এন আই এ-র অভিযোগ, এই বিস্ফোরণের পিছনে নিষিদ্ধ ইসলামি ছাত্র সংগঠন সিমি-র হাত আছে। মায়নামারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের বদলা নেওয়ার জন্যই তাদের এই কুকর্ম।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের রবীন্দ্রজন্মোৎসব

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে কবিগুরুর ১৫৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ৮থেকে১৩ মে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের আয়োজন করা হয় পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের ভারতীয়ম সাংস্কৃতিক ভবনের পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহে।

নবীন থেকে প্রবীণ, বিশিষ্ট শিল্পী থেকে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন নবাগত শিল্পীদের পরিবেশনায় একই সঙ্গে সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য ও শ্রুতিনাটকের সুন্দর সমন্বয় দেখা গেল রবীন্দ্রজন্মোৎসবের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীকান্ত আচার্য, শ্রাবণী সেন, পুবালী দেবনাথ, চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্ত, অলোক রায় চৌধুরি, রাজেশ্বর ভট্টাচার্য, মনোময় ভট্টাচার্য, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও বাচিক শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লক্ষী বর্মন, প্রণতি ঠাকুর, সুমন্ত্র সেনগুপ্ত, শোভনসুন্দর বসু। সার্বনিক দে পরিচালিত নৃত্যনাট্য 'ভানুসিংহের পদাবলী', শ্যামল মল্লিক পরিচালিত নৃত্যনাট্য 'করুণাধারায় এসো' দেবাশিস বসু পরিচালিত নৃত্যনাট্য 'বাসবদত্তা', অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ও দর্পণী পরিবেশিত 'মায়ার খেলা' দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

ভারতবর্ষই গণিত শাস্ত্রের সূতিকাগৃহ

অমিত ঘোষদস্তিদার

ভারতবর্ষে গণিতশাস্ত্রের বীজ উপ্ত হয়েছিল বৈদিক সাহিত্যে। বৈদিক ঋষিরা যাগযজ্ঞ করতে গিয়ে জ্যামিতি তথা গণিতের সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। বৈদিক যুগে বীজগণিতের উৎপত্তিও যে জ্যামিতির অঙ্কনরীতির মধ্যে নিহিত ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতীয় ত্রিকোণমিতিও জ্যামিতিভিত্তিক। কারণ বৈদিক যাগযজ্ঞ করার সময় বিভিন্ন আকারের যজ্ঞবেদী নির্মিত হতো। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ভারতবর্ষের বীজগণিত চর্চার সূত্রপাত হয়। 'বীজগণিত' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন পৃথুদকস্বামী। আগে একে 'কুট্টকগণিত', 'অব্যক্তগণিত' ইত্যাদি বলা হতো। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের হাত ধরে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে 'পাটীগণিত' নামক বিশিষ্ট শাখার প্রচলন ঘটে। 'পাটী' শব্দের অর্থ— যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি প্রকরণের ক্রমবিকাশ। 'পাটী' কথার আর একটি অর্থ 'ফলক'। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা সমস্যা ফলকের উপর ধূলো ছড়িয়ে তার উপর অঙ্কনের মাধ্যমে সমাধান করতেন। ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য প্রমুখ জ্যোতির্বিদগণ এই পদ্ধতিকে 'ধূলিকর্ম' নামে অভিহিত করেছেন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের একটি শ্লোকে গণিতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে--- '...বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্ধনিস্থিতম্'। এক থেকে দশ এবং দশের গুণিতক বিভিন্ন সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে (ঋক্ সংহিতা--- ১।১৫।৪, ১।১৫।১০, ৮।২২।৩২, ৮।৯।৯)। সংখ্যা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরিলক্ষিত হয় যজুর্বেদে। যজুর্বেদের একটি মন্ত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে— ''ইমা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বেকা চ দশ চ দশ শতং চ শতং চ সহস্রং চ সহস্রং চাযুতং চাযুতং চ নিযুতং চ নিযুতং চ প্রযুতং চার্বুদং চ ন্যর্বুদং চ সমুদ্রশ্চ মধ্যং চান্তশ্চ পরার্ধশ্চেতা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বমুত্রামুস্মিল্লোকে। (যজুর্বেদ—১৭।২)। পরবর্তীকালে আর্যভট্টীয় গ্রন্থে (২।২), শ্রীধরাচার্যের 'ত্রিশতিকা'-য় মান উল্লিখিত হয়েছে। বায়ুপুরাণের একটি শ্লোকে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে দশাঙ্ক সংখ্যা প্রণালীর আবিষ্কর্তা বলা হয়েছে— ''এষা সংখ্যাকৃতা সংখ্যা

ঈশ্বরেণ স্বয়ম্ভুবা।/গণনা বিনিবৃত্তৈষা সংখ্যা ব্রাহ্মী চ মানুষী।।''— (বায়ুপুরাণ-১০১। ২০৮)। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাপ্ত লিপি, ফলক, উৎকীর্ণলিপি প্রভৃতি থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রায় ৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেও ভারতীয়রা সংখ্যা লিখন পদ্ধতি জানতেন। ব্রাহ্মীলিপির মতো সংখ্যা লিখন পদ্ধতিও ভারতের নিজস্ব সম্পদ। পদ্ধতিগতভাবে পাটীগণিত রচিত হয় প্রথম আর্যভট্টের সময় থেকে। ভারতীয় পাটীগণিত কুড়িটি পরিকর্ম ও আটটি ব্যবহারের আলোচনায় সমৃদ্ধ। কুড়িটি পরিকর্ম হলো--- সংকলিত, ব্যবকলিত, গুণন, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল, পঞ্চজাতি, ত্রৈরাশিক, ব্যস্ত ত্রৈরাশিক, পঞ্চরাশি, সপ্তরাশি, নবরাশি, একাদশরাশি ও বদ্ধচিতি। আটটি ব্যবহার হলো— মিশ্রক, শ্রেঢ়ী, ক্ষেত্র, খাট, চিতি, ক্রাকশিক, রাশি ও ছায়া।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের মধ্যে প্রথম আর্যভট্টের 'আর্যভট্টীয়' গ্রন্থের গণিতাধ্যায়, প্রথম ভাস্করাচার্যের 'লঘুভাস্করীয়', ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত', মহাবীরের 'গণিতসারসংগ্রহ', শ্রীধরাচার্যের 'ত্রিশতিকা', লগ্গাচার্যের 'পাটীগণিতম্', মুঞ্জালভট্টের 'লঘুমানস', দ্বিতীয় আর্যভট্টের 'মহাসিদ্ধান্ত', দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি', 'লীলাবতী' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সকল গ্রন্থে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি শাখার বিভিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচিত হয়েছে।

গণিতশাস্ত্রে বা অঙ্কশাস্ত্রে বিশ্বের প্রধান রহস্যগুলির মধ্যে অন্যতম হলো শূন্যের উৎপত্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমরা যে শূন্যের ব্যবহার করি তার উৎপত্তি হয়েছিল দশমিক থেকে। বাখসালি পাণ্ডুলিপিটিতেও এর উল্লেখ মিলেছে। প্রসঙ্গত, ১৮৮১ সালে পেশোয়ারের কাছে বাখসালি নামে এক গ্রামের মাঠে চাষ করতে গিয়ে এই পাণ্ডুলিপিটি পান এক কৃষক। পরে তা হাতে পান গবেষক এএফআর হর্নলে। ১৯০২ সালে তিনি বোদালিয়ান লাইব্রেরিকে এই পাণ্ডুলিপিটি উপহার দেন। চলতি বছরের (২০১৭) ৪ অক্টোবর থেকে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'ইলিউমিনেটিং ইন্ডিয়া : ৫০০০ ইয়ারস অব সায়েন্স অ্যান্ড ইনোভেশন' নামক প্রদর্শনীতে এই বাখসালি পাণ্ডুলিপির কিছুটা অংশ প্রদর্শিত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক মার্কস দ্য সাওটয় বলেছেন, 'বাখসালি পাণ্ডুলিপিতে দশমিকের ব্যবহার অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম বড় ঘটনা। আমরা এখন জানতে পেরেছি, তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় অঙ্কবিদরা যে ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন, পরে আধুনিক বিশ্বে সেটাই অন্যতম প্রধান হয়ে উঠেছে।' ফলে বেদের সময় থেকে যে গণিতশাস্ত্রের জন্ম হয়েছিল তা আজ বিশ্বে বহু গ্রন্থ-তথ্য-প্রমাণাদি কালের অতলে হারিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রমাণ করল, বিশ্বে ভারতবর্ষই গণিতশাস্ত্রের সূতিকাগৃহ। ■

শ্রবণবেলগোলা গোমতেশ্বর

সৌমেন নিয়োগী

ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের হাসান জেলায় বেঙ্গালুরু থেকে ১৫৫ কিলোমিটার দূরে প্রায় ২ বর্গকিলোমিটার এলাকা অপূর্ব নৈসর্গিকদৃশ্যে সমৃদ্ধ। সমতল থেকে উচ্চ বিন্ধ্যগিরি পর্বতের দক্ষিণে ইন্দ্রবেট্টা (কন্নড় ভাষায়) ও উত্তরে চন্দ্রবেট্টা (কন্নড় ভাষায়) পাশাপাশি দুই পাহাড়ের ও তার পদতলে সরোবরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যে সমৃদ্ধ ও ঐতিহাসিকতায় পূর্ণ এক অপার্থিব তীর্থস্থান। সংস্কৃত 'শ্রমণ' অর্থে সন্ন্যাসী থেকে 'শ্রবণ' এবং কন্নড় ভাষায় শ্বেতপুকুর অর্থে 'বেলগোলা' থেকেই এই স্থানের নামকরণ। চন্দ্রগিরি পর্বতের দক্ষিণে পার্শ্বনাথ বসতির পাশে গঙ্গারাজদের রাজত্বকালে খোদিত শিলালেখে শ্রবণবেলগোলার ধর্মীয় ঐতিহাসিকতা ব্যক্ত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তীব্র দুর্ভিক্ষের জন্যে উজ্জয়িনী থেকে জৈন আচার্য ভদ্রবাহু দক্ষিণের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং অবশেষে শ্রবণবেলগোলায় তাঁর সমস্ত শিষ্য সমেত উপস্থিত হন। তাদের মধ্যে অন্যতম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যও এই স্থানে চলে আসেন আধ্যাত্মিক উন্মেষণ ও সাধনের জন্যে এবং এখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়। কাজেই এর থেকে শুরু হয় এই স্থানের ধর্মীয় মাহাত্ম্য। ফলস্বরূপ গঙ্গারাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইন্দ্রগিরি পর্বতে নির্মিত এক ও অদ্বিতীয় মনোলিথিক বাহুবলী বা গোমতেশ্বর 'কায়তস্বর্গ' মুদ্রায় দণ্ডায়মান মূর্তি, স্বমহিমায় রাজকীয় ঐশ্বর্য ও আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ হয়ে সহস্র বছর ধরে দণ্ডায়মান রয়েছে।

ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল থেকেই তপস্যা, সংযম, বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতার মূল সোপানের প্রতি সদা যত্নশীল। এদেশের মানুষের মধ্যে মনুষ্য জীবনের মূল উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাই প্রাচীনকালে রাজ্যনবর্গ যুগ যুগ ধরে জাগতিক ঐশ্বর্য তুচ্ছ করে ব্রতী হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনায়। বাহুবলী বা গোমতেশ্বর মূর্তি হলো সেই লোকশ্রুত জৈনধর্মের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা গঙ্গা শিল্পকলার এক স্বর্গীয় ভাব বহন করে চলেছে। ইন্দ্রগিরি পাহাড়ের চূড়ো কুঁদে গঙ্গারাজ রাজামল্লার (৯৭৪ থেকে ৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে) মন্ত্রী চামুন্দায়া স্বপ্নাদেশ পাওয়ায় নির্মীত হয়েছে বিশালাকার বাহুবলীর দিগম্বর মূর্তি। বিচলিত মনের উপর শান্তি, জয় ও নির্বাণ প্রাপ্তির এক সুউচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তন ও মননের এক অমোঘ শ্রদ্ধার্ঘ্য রূপে তা আবাহমানকাল সকল মানুষকে আকৃষ্ট করে চলেছে।

ঋজু ভঙ্গিমায় আত্মসংযমের চূড়ান্ত প্রকাশ স্বরূপ হাত ও পায়ে প্যাঁচানো লতাগুল্ম বেষ্টিত পিঁপড়ে ও সাপের উপর দণ্ডায়মান দিগম্বর মূর্তি সমগ্র মানসিক ও জাগতিক যন্ত্রণার থেকে বিজয় প্রাপ্তি হেতু স্মিত হাসি মোক্ষপ্রাপ্তির এক চরম প্রতীকরূপ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। এই লোকশ্রুতি জৈন কবি বাপান্না কর্তৃক কন্নড় ভাষায় ১১৮০ খ্রিস্টাব্দের শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। জৈনধর্মের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব অযোধ্যার রাজত্ব ত্যাগ করে বাণপ্রস্থে গেলে, রাজসিংহাসন নিয়ে তাঁর দুই পুত্র বাহুবলী ও ভরতের মধ্যে ক্ষমতা দখল হেতু সংঘাত বাধে। জৈন সন্ন্যাসীদের পরামর্শে দুইভাই ধর্মযুদ্ধে উপনীত হন। বাহুবলী ভরতকে পরাস্ত করেন ও বিজিত ভাইকে সিংহাসন দান করে বাণপ্রস্থে প্রতীক্ষাযোগ স্বরূপ মূর্তির ন্যায় ধ্যানস্থ হন এবং মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সমস্ত জাগতিক ও মানসিক অভিলাষকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করেন। অতীতের এই ধর্মকথাই অর্থাৎ বৈরাগ্য ও সংযম ব্যক্ত হয়েছে মন্ত্রী চামুন্দায়া উদ্যোগে সম্পূর্ণ গ্রানাইট পাথরের তৈরি বিশ্বের উচ্চতম (১৭.৫ মি.) এই মনোলিথিক মূর্তিতে। আত্মোপলব্ধিই মোক্ষপ্রাপ্তির এক ও অদ্বিতীয় পথ যা মহাপুরুষ লক্ষণ বিশিষ্ট অতিকায় দিগম্বর মূর্তিটি জৈনধর্মের মূলকথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছে এই রূপ শিল্প ভাবনায় সমৃদ্ধ মূর্তিতত্ত্বের মাধ্যমে। ''Form is consummated by the idea. Form and idea are united in the Divine unknown power. The feeling of awe is not towards the spiritual power, but towards the majesty of human power–the asceticts will power. It leads one to the inner world of pure sprit, spirit of self realization of the virtues of ahimsa, self-control and truthfulness.'' সমতল থেকে ৬১৪ ধাপের খাড়া সিঁড়ি উঠেছে মূর্তির পাদদেশে। প্রতি দ্বাদশ বর্ষ অন্তর পালিত হয় গোমতেশ্বর মূর্তির মহামস্তকাভিষেক উৎসব। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের শিলালিপিতে প্রথম এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ∎

আমের তুমি, আমের আমি, নাম দিয়ে যায় চেনা

স্বপন দাস

গবেষকরা দেখিয়েছেন ম্যাঙ্গো শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে দক্ষিণ ভারত থেকে, আজ থেকে ৫০০ বছর আগে নাকি পর্তুগিজদের আবিষ্কার এই ফলটি। দক্ষিণ ভারতে নামটি এসেছে ম্যাস্কে ম্যানগে ম্যানগা ম্যাঙ্গো। তবে সারা পৃথিবীতে এটা নিয়ে গবেষণা চলছে।

বর্তমানে ভারতে ৩৪৭ প্রজাতির আম রয়েছে।

ফজলি, আশ্বিনা, ক্ষীরমন, সেন্দুরা গুটি, ল্যাংড়া, গৌড়মতি, গোপালভোগ, মধু চুষকী, বৃন্দাবনী, লখনা, তোতাপুরী, রানি পছন্দ, ক্ষীরসাপাতি, আম্রপালী, হিমসাগর, বাতাসা, খুদি ঘিরসা, বোম্বাই, সুরমা ফজলি, সুন্দরী, বৈশাখী, মিয়ার চারা, রস কি জাহান, হীরালাল বোম্বাই, ওকরাং, মালদা, শেরীধন, শামসুল সামার, বাদশা, রস কি গুলিস্তান, কন্দমুকাররার, নাম ডক মাই, বোম্বাই (চাঁপাই) ক্যালেন্ডা, রুবি, বোগলা, মালগোভা, হিমসাগর রাজশাহী, কালুয়া, চৌষা লখনৌ, সিডলেস, কালীভোগ, বাদশাভোগ, কৃষ্ণকলি, পাটনাই, গুটি লক্ষণভোগ, বাগান বিলাস, গুটি ল্যাংড়া, পাটুরিয়া, পালসার, আমিনা, কাকাতুয়া, চালিতা গুটি, রং ভিলা, বুদ্ধ কালুয়া, রাজলক্ষ্মী, মাধুরী, ব্যাঙ্গালোরা, বন খাসা, পারিজা, চন্দনখোস, দুধ কুমারী, ছাতাপোরা, চোষা, জিলাপি কাড়া, শীতলপাটি, পুজারি ভোগ, জগৎ মোহিনী, দিলসাদ, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি, বেগম বাহার, রাজা ভুলানি, নাবি বোম্বাই, সিন্দি, ভুতো বোম্বাই, গোলেক, বারি আম, কালী বোম্বাই, চকচকা, পেয়ারাফুলি, ভ্যালেনাটো, সিন্দুরী ফজলি, আমব্রা, গুলাবজামুন, আলম শাহী, অস্ট্রেলিয়ান আম, মায়া, দাদাভোগ, শরবতি ব্রাউন, আলফান, রত্না, লাড্ডু সান্দিলা, ছোটিবোম্বাই, কালিজংগি, দ্বারিকা ফজলি, মিঠুয়া, বোম্বে সায়া, বোম্বে গ্রিন, তোহফা, কাচ্চা মিঠা, মালিহাবাদ, তৈমুরিয়া, জাহাঙ্গির, কাওয়াশজি প্যাটেল, নোশা, জালিবাম, বাগান পল্লি, ভারতভোগ, ফজরী কলন, সাবিনা, সেনসেশন, লতা বোম্বাই, আল্লামপুর বানেশাল, আর-২ এফ, শ্রাবণী, ইমামপছন্দ, জনার্দনপছন্দ, কৃষ্ণভোগ, সারুলি, ইলশে পেটি, কলম বাজি, ইয়াকুতিয়া, গুটী, ভুজাহাজরী, ম্যাটরাজ, সামার বাহিতশত আলীবাগ, গোলাপবাস, জুলী, ভেজপুরী, কালুয়া গোপালভোগ, কলম সুন্দরী, বনারাজ, ম্যাডাম ফ্রান্সিস, মিক্সড স্পেশাল, মোহাম্মদওয়ালা, সফেদা মালিহাবাদ, খান বিলাস, জাফরান, মধু মালতী, জিতুভোগ, পলকপুরী, কাকরহিয়া সিকরি, পাথুরিয়া, বোম্বে কলন, কেনসিংটন, কাকরহান, মিছরি দমদম, সামার বাহিস্ত, মানজানিল্লো নুনেজ, নাজুকবদন, ফারুকভোগ, রুমানি, টারপেন টাইন, কেনসিংটন কাকরহান, মিছরি দমদম, সামার বাহিস্ত, মানজানিল্লো নুনেজ, নাজুকবদন, ফারুকভোগ, রুমালি, টারপেন টাইন, কুমড়া জালি, দুধিয়া, মহারাজ পছন্দ, ম্যানিলা, পিয়ারি, জান মাহমুদ, সামার বাহিশত রামপুর, মাডু, লা জবাব মালিহাবাদ, লাইলী আলুপুর, নীলম, মিশ্রীভোগ, পদ্মমধু, বাঙামুড়ী, পুনিত, বেলখাস, শ্রীধন, আমান খুর্দ বুলন্দাবাগ, পালমার, কারাবাউ, অ্যামিলি, কোরাকাও ডি বই, নিসার পছন্দ, পাহুতান, বোররন, হিন্দি, সফেদা বাদশাবাগ, র‍্যাড, আরুমানিস, বাংলা ওয়ালা, মোম্বাসা, রোসা, ক্যাম্বোডিয়ানা, ফজরী জাফরানী, বোম্বাইখুর্দ, এক্সট্রিমা, বদরুল আসমার, শাদওয়ালা, সামার বাহিশত কারানা, এসপাড়া, বার্শী বোম্বাই, কর্পূরা, হুসনে আরা, সফেদা লখনৌ, শাদউল্লা, আজিজপছন্দ,কর্পূরীভোগ, জিল, সারোহি, গ্লেন, টমি অ্যাটকিনসন, স্যাম-রু-ডু, মাবরোকা, হিমাউদ্দিন, ফ্লোরিডা, কেইট, ইরউইন, নাওমি, কেন্ট, টাম অ্যাটকিল, আলফন্সো, নারিকেল ফাঁকি, জামাই পছন্দ, লক্ষণভোগ, ভাদুরিয়া কালুয়া, চিনি ফজলি, মল্লিকা, সূর্যপুরী, হায়াতি, পাউথান, দুধসর, গোলাপখাস, বেনারসি ল্যাংড়া, পাটনামজাথি, জালিবান্দা, মিছরিদানা, নাক ফজলি, সুবর্ণরেখা, কালাপাহাড়, বারি আম, বউ ভুলানি, জমরুদ, অরুণা, নীলাম্বরী, ফোনিয়া, চৌষা, ডায়াবেটিক আম, সিন্ধু, বোগলাগুটি, রাজভোগ, দুধস্বর (ছোট), মোহন ভোগ, হাঁড়িভাঙ্গা, টিক্কা ফরাশ, আম্রপালী (বড়), হিমসাগর, মৌচাক, মহানন্দা, তোতাপুরী, বাউ আম, বারি, পুকুর পাড়, কোহিতুর, বিলু পছন্দ, কাগরি, চিনিবাসা, দুধ কুমার, মন্ডা, লাড্ডু, সীতাভোগ, শোভা পছন্দ, গৃঠাদাগী, ছোট আশ্বিনা, ঝুমকা, দুসেহরি, কালী ভোগ, ভবানী চরুষ, আলফাজ বোম্বাই, মধুমণি, মিশ্রীকান্ত, গিড়াদাগী, কুয়া পাহাড়ি, বিড়া, দ্বারভাঙ্গা, বারি আম, আরাজাম, গোবিন্দ ভোগ, কাঁচামিঠা, মতিমণ্ডা, পোল্লাদাগী, দাদভোগ, শ্যামলতা, মিশ্রীদাগী, কিষাণ ভোগ, ভারতী, বারোমাসি, দেওভোগ, বারি, আম্রপালী (ছোট), সিদ্দিক পছন্দ, লতা, বাদামি, আনারস, জহুরী, রাখাল ভোগ, গুটি মালদা, বারি আম, রগনী, বাউনিলতা, গৌরজিত, বেগমফুলি, আপুস, ফজরিগোলা, সফেদা, আনোয়ার রাতাউল, বাবুই ঝাঁকি, মনোহারা, রাংগোয়াই, গোল্লা, কাজি পছন্দ, রাঙামুড়ি, বড়বাবু, কলল্লা, জালিখাস, কালিয়া, সাটিয়ারকরা, সফদর পছন্দ, ছুঁচামুখি, বারি আম-৫, কাদের পছন্দ, এফটি আইপি বাউ আম, দিল্লির লাড়ুয়া, টিয়াকাটি, এফটি আইপি বাউ আম-৯ (সৌখিন চৌফলা)।

এফটি আইপি বাউ আম-১ (শ্রাবণী-১), এফটি আইপি বাউ আম-৭, (পলি অ্যাম্বব্রায়নী-২), এফটি আইপি বাউ আম-২ (সিঁদুরী), এফটি আইপি বাউ আম-১০ (শৌখিন-২), এফটি আইপি বাউ আম-৩ (ডায়াবেটিক), এফটি আইপি বাউ আম-৮ (পলি অ্যাম্বব্রায়নি- রাংগুয়াই-৩), এফটি আইপি বাউ আম-১১ (কাঁচা মিঠা-১), এফটি আইপি বাউ আম-৬ (পলি অ্যাম্বব্রায়নি-১), এফটি আইপি বাউ আম-১২ (কাঁচা মিঠা-২) এফটি আইপি বাউ আম-১৩ (কাঁচামিঠা-৩), এফটি আইপি বাউ আম-৫ (শ্রাবণী-২)। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

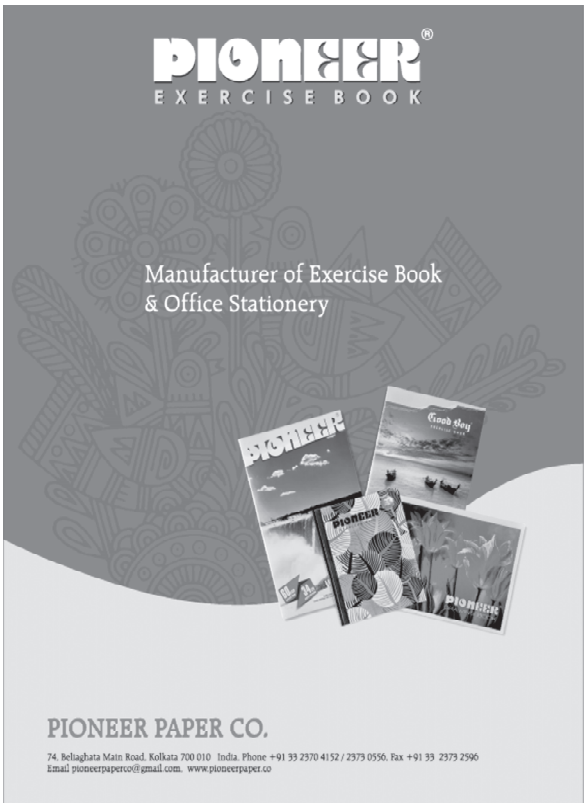

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

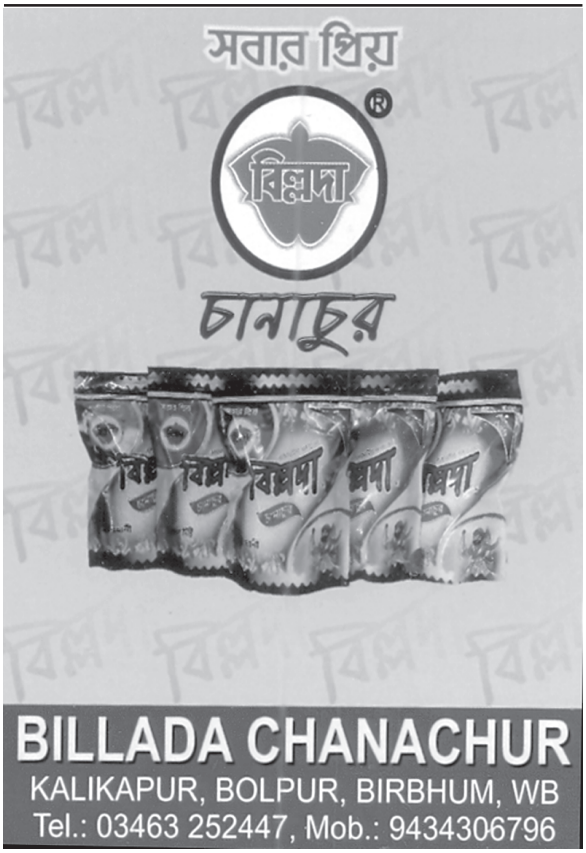

চোর

সন্দীপ চক্রবর্তী

শশী সাইকেলটা গাছের নীচে রেখে লাফ মেরে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের ভেতর। সেই কখন থেকে তলপেটটা টাটাচ্ছে। মুশকিল হলো নিরিবিলি জায়গা না পেলে শশী পেচ্ছাপ করতে পারে না।

কাজ শেষ করে শশী আরামের শ্বাস ছাড়ল। বেলা মন্দ হয়নি। সাড়ে চারটে বাজে। খিদেও পেয়েছে বেশ। এগারোটার সময় ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়েছিল। তারপর তিনখানা গ্রামের খানদশেক বাড়ি চষে বেড়িয়ে এই ফিরছে।

মাঝে মাঝে শশীর হাসি পায়। তার কাজটাই অদ্ভুত। নামে কম্পাউন্ডার হলে কী হয়, হারান ডাক্তার তাকে দিয়ে পাওনাদারের কাজও করিয়ে নেয়।

বিএসসি পাশ করার পর বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে শশী চাকরিটা পেয়েছিল। হোমিওপ্যাথ হলেও হারান ডাক্তারের জমজমাট পসার। কিন্তু নগদ টাকা খরচ করে চিকিৎসা করানোর লোক এ অঞ্চলে দিন দিন কমে যাচ্ছে। বেশিরভাগই ধারবাকির রুগি। একটা মোটা খাতায় মাসকাবারি হিসেবপত্তর শশীকেই লিখে রাখতে হয়। মাস ফুরোলে খাতা বগলে করে বেরিয়ে বাকিবকেয়া আদায় করার ভারও তার ওপর।

লোকের পকেট থেকে টাকা বের করা যে কী ঝকমারির কাজ শশী জানে। তবে আজকের দিনটা মোটের ওপর মন্দ নয়। ন'শো আশি টাকা আদায় হয়েছে। মানিব্যাগের ভারে প্যান্টের ডানদিকের পকেটটা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। শশীর এলেম দেখে হারান ডাক্তার খুশিই হবে।

শশী পা চালিয়ে গাছতলায় ফিরে এল। কিন্তু যা দেখল তাতে তার ভিরমি খাবার জোগাড়। সাইকেলটা নেই। জায়গাটা একদম খাঁ খাঁ করছে। অথচ শশীর স্পষ্ট মনে আছে সে এই বেলগাছের নীচেই সাইকেলটা রেখেছিল। তাড়াতাড়িতে চাবি দিয়ে যাওয়ার কথা মনে ছিল না। আর দেবেই বা কেন? রাস্তায় লোকজন কিছু কম নেই। দিনেরবেলা। এই অবস্থায় একটা আস্ত সাইকেল হাপিস হয়ে যাবে এ কথা কেই বা আগে থাকতে ভাবতে পারে।

যাই হোক, তন্নতন্ন করে খুঁজেও সাইকেল পাওয়া গেল না।

হতাশায় শশীর চোখে জল এসে গেল। সাইকেলটা হারান ডাক্তারের। শশী যদি গিয়ে বলে সাইকেল চুরি হয়ে গেছে তা হলে আজই নির্ঘাত চাকরিটা চলে যাবে। বাড়িতে তার বাবা-মা ছাড়াও বউ আছে। একটা দু'বছরের বাচ্চা আছে।

ছেলের কথা মনে পড়া মাত্র শশী আর নিজেকে সামলাতে পারল না। খেয়াল করল না রাস্তার ওপারে একজন তাকে দেখছে।

একজন অর্থাৎ মাধু।

মাধু গিয়েছিল কায়েতপাড়ার চৌধুরীবাড়িতে নীলষষ্ঠীর পুজো দেখতে। ফেরার সময় এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড! হয়তো চোখ ফিরিয়ে চলে যাওয়া যেত। কিন্তু চোরটাকে চিনতে পেরেই হয়েছে যত মুশকিল।

সাইকেল খোয়ানো লোকটা অবশ্য অচেনা। অমন একটি কার্তিক ঠাকুর বাঁকিপুরে থাকলে মাধু চিনত। কিন্তু দেখতে ভালো হলেই তো আর হয় না, লোকটার মাথাটা একেবারে গোবরে ঠাসা। না হলে ন্যাংটো জায়গায় সাইকেল রেখে কেউ ডাকে যায়! বলদা কোথাকার! এখন আবার বসে বসে কাঁদছে।

আর সেটাই মাধুর বিরক্তির কারণ। ব্যাটাছেলের কান্না সে মোটে সহ্য করতে পারে না। মা মারা যাবার পর গবা ঠিক এমনি করে কাঁদত। মাধুর মনে হতো সে-ও তো মেয়েমানুষ। সে কেন গবার মা হয়ে উঠতে পারে না? রাত একটু গভীর হলে নিজের খোলা বুক দেখিয়ে সে গবাকে ডাকত, 'এই দ্যাখ। এখেনেও মা আছে।'

মাধু মনস্থির করে ফেলল। চোরটাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। রাস্তা পেরিয়ে শশীর সামনে গিয়ে বলল, 'তুমি কে গা? কোথা থেকে আসতেছ?'

শশী মুখ তুলল। মাধুকে দেখে বেশিরভাগ চোখই একটু মাংসাশী হয়ে ওঠে। হদ্দ গরিব হলেও সে দেখতে খারাপ নয়। তার ওপর ভরন্ত শরীর। শাড়ি-ব্লাউজেরও ছিরিছাঁদ নেই। বশ মানায় কার সাধ্যি!

কিন্তু শশীর এখন মেয়েছেলে দেখার মতো মেজাজ নেই। সে তেড়িয়া হলে বলল, 'আমি কে জেনে হবেটা কী? ফ্যাচফ্যাচ না করে এখান থেকে যাও।'

'আহা রাগ করো ক্যান! এখেনে বসে কাঁদাকাটা করলে কি কাজ হবে? তার চে আমার সাথে চলো।'

'তোমার সঙ্গে খামোখা যাব কেন! কে তুমি?'

'আমি মাধু। এখনও আলো আছে। এই বেলা গেলে সাকেলটা পেয়ে যেতে পারো।'

শশীর সন্দেহ হলো। মেয়েটা নিশ্চয় চোরের স্যাঙাত। সাইকেল নিয়ে ব্যাটা বোধহয় এখনও পালাতে পারেনি। তাই মেয়েটাকে পাঠিয়েছে তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে।

মাধুর একটা হাত খপ করে ধরে শশী বলল, 'এক চড়ে তোর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দোব। সাইকেল কোথায় রেখেছিস শীগগির বল।'

হাত ছাড়াবার চেষ্টা না করে মাধু বলল, 'ও বাবা, ফোঁস করতেও জানো দেখছি। এতই যখন তেজ বসে বসে কাঁদছিলে ক্যান?'

'তেজের কী দেখেছিস তুই? সাইকেল ফেরত না দিলে পুলিশের ডাণ্ডা খেয়ে মরবি।'

'আমি তো মরেই আছি গো। তোমার জন্যি আর এ জেবনে মরা হলুনি।' মাধু খিলখিল করে হাসল। তারপর অনায়াসে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'শোনো গো ভদ্দরলোক, তোমার সঙ্গে মশকরা করতে আসিনি। চোরকে আমি চিনি। সে কোথায় চোরাই মাল রাখে তাও জানি। সাইকেল যদি ফেরত চাও তো আমার সাথে চলো। নয়তো আমি চললুম। আমার কাজ আছে।'

শশীর বিশ্বাস হলো না। কিন্তু এই মুহূর্তে বিশ্বাস করা ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। সে ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি সত্যি জানো? আগে বলোনি কেন?'

'মরণদশা! বলতে দিলে কোথায়? এখন যাবে, নাকি আমি পথ দেখব?'

শশীকে নিয়ে মাধু যখন গ্রামের শেষ মাথায় একটা প্রায় ভূতে-পাওয়া বাড়িতে হাজির হলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়িটার চারপাশে জঙ্গল। আর কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। গ্রামের ছেলে হলেও শশীর সাপের ভয় মারাত্মক। কিন্তু আজ তার ভয়ডর উবে গেছে। চাকরি চলে গেলে সংসারটার কী অবস্থা হবে সেই চিন্তায় সে অস্থির।

বাড়ির পিছনদিকে একটা বিশাল কুয়ো। তারই পাড় ঘেঁষে সাইকেলটা দাঁড় করানো রয়েছে। শশীর বুকের ভেতর থম মেরে থাকা বাতাসটা এতক্ষণে মুক্ত হলো। মেয়েটা তা হলে মিথ্যে কথা বলেনি। শশী আর দেরি না করে কুয়োর দিকে পা বাড়াল।

'ও কী গো! সাইকেল পেয়ে আমায় যে ভুলে গেলে!'

শশী লজ্জা পেল, 'ভুলব কেন! তোমার জন্যেই তো পেলুম।'

মাধুর পুরুষ্টু ঠোঁটে গা সিরসিরে হাসি। চোখে অদ্ভুত চাউনি। শাড়ির আঁচল সরে গিয়ে ভারী বুক দুটো চাঁদের আলোয় চকচক করছে। চৈত্র মাসের সন্ধ্যেবেলায় তত গরম নেই। তবুও মাধুর সারা শরীরে ঘাম।

শশী বাধা দেবার সময় পেল না। মাধু তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সে কথা কে জানতে চেয়েছে শুনি? তুমি এমন কাত্তিক ঠাকুর। সোহাগ না করে ছেড়ে দিলে মাধুর রাতে ঘুম আসবে ভেবেছ?'

শশী স্তম্ভিত। মেয়েটা পাগলের মতো তার বুকে মুখ ঘষছে। আর তার হাতের আঙুলগুলো শশীর কোমরের কাছে কিলবিল করছে।

কিছুক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর শশীর সংবিৎ ফিরল। কিন্তু নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে সে টের পেল তার শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। চিৎকার করতে গিয়েও পারল না।

শশীর জামার বোতামগুলো একটানে ছিঁড়ে ফেলল মাধু। তারপর শশীর রোমশ বুক থেকে বাঘিনীর মতো মুখ তুলে বলল, 'আমাকে পাওয়ার জন্যি গেরামের সবাই পাগল গো কাত্তিক। আর তুমি পেয়েও দাম দিচ্ছুনি। এ বাড়িতে অনেক ঘর আছে। একবার চেখে দেখবে নাকি মাধুকে?'

ভয়ে শশীর রোমকূপ খাড়া হয়ে গেল। তার বাড়ি এখান থেকে আরও মাইলপাঁচেক। এখানকার কাউকে সে চেনে না। যদি কেউ দেখে ফেলে তাকেই দোষ দেবে। মারধরও জুটতে পারে।

ধাক্কা মেরে মাধুকে মাটিতে ফেলে শশী সাইকেল নিয়ে দৌড় দিল। মাধুর হাসির শব্দ কানে গেলেও পিছন ফিরে দেখল না।

শশী চলে যাবার পর মাধু এলোমেলো ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। হাটচালার শিবমন্দিরের দরজা সাতটায় বন্ধ হয়ে যায়। মাধু বাইরে থেকে প্রণাম করল। স্টেশন বাজার এলাকা। অষ্টপ্রহর হট্টগোল। ভোলা ঘোষের জিলিপির বারকোশে এখনও দু'চারটে পড়ে আছে। গবা খেতে খুব ভালোবাসে। কিন্তু আকালের বাজারে একসঙ্গে এতগুলো টাকা খরচ করা কি ঠিক হবে?

গবা রোয়াকে বসে বিড়ি টানছিল। মাধুকে দেখে বলল, 'এই তোর ফেরার সময় হলো? বউ মানুষ ঘরে থাকতে পারিস না?'

ছায়াভরা চোখে মাধু ঘরের দিকে চেয়ে রইল। এই তার ঘর। সংসার। মাটির দেওয়ালের ওপর খড়ের ছাউনি। খড় সরে গিয়ে ফি-বছর বৃষ্টির জল পড়ে। শীতের উত্তুরে হাওয়ায় থরথরানি ধরে যায়। তবুও ঘরটা মাধুর বড়ো প্রিয়। আর ওই কথাটা, বউমানুষ! যতবার শোনে মাধুর কান জুড়িয়ে যায়। বারবার এই পৃথিবীতে গবার বউ হয়ে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে।

আধপোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে গবা বলল, 'আজ মাইরি একটা বেড়ে মাল হাতিয়েছি। কম করে পাঁচশো টাকা পকেটে আসবে। এখন যাই সনাতনকে খবরটা দিই গে।'

'এই সাঁঝবেলায় তোকে কোথাও যেতে হবেনে।'

'যেতে হবেনে মানে!'

'যার মাল সে নিয়ে চলে গেছে।'

গবা আজ আশাতিরিক্ত উদার। বউকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, 'তা, কী করে গেল শুনি? ভূত হয়ে?'

'পেতনি হয়ে। আর সেই পেতনিটা আমি। তোকে আমি আর চুরি করতে দুবুনি গবা।'

গবার চোখে অবিশ্বাস। কিন্তু মাধু মিথ্যে কথা বলার মেয়ে নয়। এক ঝটকায় মাধুকে মাটিতে নামাল গবা। তারপর তার গালে সপাটে একটা চড় কষিয়ে বলল, 'চুরি না করলে খাবি কী রে মাগি?'

মাধুর কোনও হেলদোল দেখা গেল না। গবার হাতে নিত্যদিন সে মার খায়। কানের লতি থেকে খসে পড়া নিকেলের দুলটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ক্যান! আমি চুরি করব। তোকে কেউ চোর বললে আমার কষ্ট হয়। আমায় যা খুশি বলুক।'

কথাটা নতুন নয়। মাধু অনেকবার বলেছে। গবা কান দেয়নি। মেয়েমানুষ ওরকম বলে। খ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে গিয়ে মাধুর চুল ধরে মাটিতে ফেলে গবা কিল আর লাথির বন্যা বইয়ে দিল। মাধু শক্ত স্বভাবের মেয়ে। একটা টু শব্দ পর্যন্ত করল না। গবাই বরং ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল।

মাধু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, 'মার। যত খুশি মার। কিন্তুক জেনে রাখ চুরি আমি করতে জানি। দেখবি'? ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছিল। তবুও মাধু হাসল। তারপর ছেঁড়া ব্লাউজের ভেতর থেকে শশীর মানিব্যাগটা বের করে গবার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'দ্যাখ ঢ্যামনা, দ্যাখ!'

গবার শরীরে যত আগুন ছিল এক ঝটকায় সব জল। জলের ভেতর পচা শ্যাওলার মতো ভয়। ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখদুটো তুলে গবা বলল, 'তুই চুরি করলি মাধু?'

'বেশ করব চুরি করব। এরপর গেরামের লোক তোকে মন্দ বলে দেখুক। কী হাল করি দ্যাখ।'

কী বলবে বুঝতে না পেরে গবা তাকিয়ে রইল। মাধু জেদি, একরোখা। গবার জন্য সে পারে না এমন কাজ নেই। গবাও তাই। তারও কোনও সমাজ নেই, দেশ নেই। শুধু একটা মাধু আছে। গবার বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। অনেকবার সে চুরিচামারি ছাড়তে চেয়েছে। যা হোক একটা কাজের জন্য কত লোকের হাতেপায়ে ধরেছে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে কাজ দেয়নি। আজ যা হলো এরপরও যদি সে সর্বনাশকে না আটকায় তাহলে বোধহয় মাধু একদিন পুরোপুরি পাঁকে ডুবে যাবে। পুরুষ দাগি হয়েও ফিরতে পারে। কিন্তু মেয়েমানুষের লক্ষ্মীর পা! চৌকাঠ পেরোলেই চঞ্চল। ঠাঁইনাড়া হলেই অচেনা।

অনেকক্ষণ পর গবা কথা খুঁজে পেল, 'যা করেছিস, করেছিস। আর কখনও তুই চুরি করবি না।'

'আ মোলো! কী বললুম তা হলে এতক্ষণ!'

'চোপা বন্ধ কর মাধু। নইলে আজ তোকে মেরেই ফেলব।'

'মার না। আমি তোকে ভয় করি নাকি?'

গবা টের পেল হাওয়া পেয়ে বুকের আগুনটা আবার ফুঁসছে। তবে সেটা কীসের আগুন বোঝা মুশকিল। চোখে জল যেমন আসছে হাত দুটোও নিশপিশ করছে আঘাত করার জন্য। সোয়ামিকে ভয় না করা আর ভালো না বাসা তো একই জিনিস। একবার চুরি করেই মাধু উড়ছে। উড়তে উড়তে সোয়ামির হাতের ঘেরে আর যদি না ফেরে?

উঠোনে একটা খেঁটে বাঁশ পড়েছিল। গবা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে এলোপাথারি মারতে শুরু করল। মাধু লুটিয়ে না পড়া পর্যন্ত থামল না। তারপর রক্তাক্ত মাধুর মুখের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'ভয় করিস না তো কী করিস তুই?'

মাধুর কথা বলার শক্তি ছিল না। রাজ্যের ঘুম নামছে তার চোখে। তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে বুক। তবুও গবাকে এত কাছে পেয়ে আদুরে গলায় বলল, 'মরণ! জানেনে যেন!' ■

ক্রীতদাস প্রথা

আমরা সবাই জানি, বাজারে কিংবা শপিং মলে সব জিনিসই কিনতে পাওয়া যায়। জিনিসপত্রের পাশাপাশি মাছ, হাঁস, মুরগি, পায়রা, গোরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পাখিও বিশেষ বিশেষ বাজারে পাওয়া যায়। ক্রেতারা সেগুলো বাজার থেকে কিনে নিয়ে যায়। এই পশু-পাখিদের মতো একসময় মানুষও বিক্রি হতো বাজারে। মানুষ নির্মম ভাবে মানুষকেই বেচে দিত আর মানুষই অবলীলায় মানুষকে কিনে নিয়ে ঘরে যেত। ভাবতেও অবাক লাগে তাই না! প্রকাশ্যে মানুষ কেনাবেচার প্রথাকে বলা হতো ক্রীতদাস প্রথা।

রুগ্ন চেহারার লোক বিক্রি হতো কম দামে, মোটাসোটা লোক বিক্রি হতো বেশি দামে। এই স্বাধীন মানুষগুলি হয়ে যেত পরাধীন, হয়ে যেত ক্রীতদাস। যারা এদের কিনে আনত তারা এদের দিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ করাত। দিন রাত শুধু কাজ আর কাজ। পয়সা দিয়ে কিনেছে আদর যত্ন করার জন্য নাকি! শুধু বাঁচিয়ে রাখার জন্য যৎসামান্য অরুচিকর অস্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়া হতো। ওই স্বল্প আহারের বিনিময়ে দিনরাত খেটে যেত এরা। বিশ্রামের সময়টুকুও ছিল না এদের। খিদের জ্বালায় মেঝেতে শুয়ে হাপুস নয়নে কাঁদত সারা রাত। তার ওপর মালিক কখন যে দরজায় কড়া নাড়াবে কে জানে! দু'দণ্ড শান্তির ঘুমটুকুও ছিল না এদের।

একমুঠো খাবারের আশায়, বেঁচে থাকার তাগিদে মালিকের হুকুমের গোলাম হয়ে থাকতে হতো ক্রীতদাসদের। শুধু কী তাই, খুব অত্যাচার করা হতো ক্রীতদাসদের ওপর। পান থেকে চুন খসলেই পিঠে

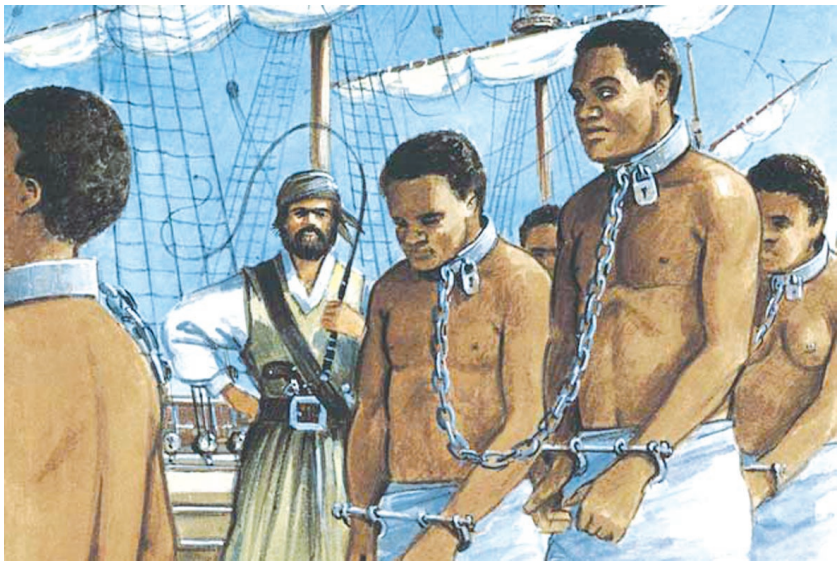

পড়ত চাবুকের আঘাত। মালিক যদি ইচ্ছা করে তবে আবার অন্য হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিতে পারে। বিক্রির কয়েকদিন আগে থেকে ভালো করে অর্থাৎ বেশি করে খাবার দেওয়া হতো, যাতে এরা মোটাসোটা হয় আর বেশি দাম পাওয়া যায়। দুর্বল দাস বিক্রি করে দিয়ে অন্য একটি মোটাসোটা ছেলে কিনে আনত। দাসবাজারে ক্রেতা, বিক্রেতা ও পণ্য সবই মানুষ। কী নিষ্ঠুর প্রথা! ক্রেতা ও বিক্রেতার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র মমত্ববোধ ছিল না। আজ এ মালিকের ঘরে, কাল অন্য মালিকের ঘরে দাসত্ব করে গোটা জীবন কাটিয়ে দিত এই অসহায় লোকগুলি। ইউরোপ আফ্রিকার মতো ভারতেও এক সময় ছিল এই অমানবিক প্রথা।

আজ এই নির্মম প্রথা নেই, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে কি? প্রকাশ্যে মানুষ বিক্রি হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু পর্দার আড়ালে আজও কোনও মা অভাবের তাড়নায় ছেলে-মেয়েকে বিক্রি করে দিচ্ছে। আজও 'ছেলে ধরা'-দের মূল বিনষ্ট হয়নি। এদের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে সারা দেশে, এরা নানাভাবে ফাঁদ পেতে ছেলে-মেয়েদের ধরে অন্য রাজ্যে এমনকী অন্য দেশে টাকার লোভে পাচার করে দেয়। তাই খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। স্কুল-কলেজে পড়া ছোটো বন্ধুরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার সময় খুব সাবধান থাকতে হবে। অপরিচিত কারোর সঙ্গে খোঁজ খবর না নিয়ে বন্ধুত্ব করবে না। খুব ছোটোরা বাইরে বেরুলে বড়োদের হাত ধরে থাকবে।

উমা বিশ্বাস

ভারতের পথে পথে

পরশুরাম কুণ্ড

উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল প্রদেশের লোহিত জেলায় লোহিত নদীর দক্ষিণ তীরে এক বাঁকের মুখে ৭০ ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট চওড়া পুণ্য হিন্দু তীর্থ পরশুরাম কুণ্ড। পুরাণে আছে, মহাতেজা মুনি জমদগ্নি কোনও কারণে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তাঁর পুত্রদের তাদের মা-কে হত্যা করার নির্দেশ দিলে একমাত্র পরশুরামই তা পালন করেন। মাতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই কুণ্ডে স্নান করলে পরশুরাম পাপমুক্ত হন এবং মা রেণুকাদেবী পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন। ১৯৭১ সালে এখানে নতুন করে পরশুরামের মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়েছে। মাঘী পূর্ণিমায় এখানে একমাস ব্যাপী মেলা বসে। দেশ বিদেশ থেকে পুণ্যার্থীর দল স্নান করতে আসেন। মা-বাবা জীবিত থাকতে নাকি এখানে ডুব দিতে নেই। কুণ্ডের উপরে পাহাড়ে পরশুরামের মন্দির রয়েছে।

জানো কি?

- তুলাগাছকে সূর্যের কন্যা বলা হয়।
- পাথরকুচিগাছ পাতা থেকে জন্মায়।
- নারিকেল গাছকে স্বর্গীয় গাছ বলা হয়।
- আমগাছের বাতাস শোধন করার ক্ষমতা বেশি।
- নাশপাতিগাছ তিনশো বছর ফল দেয়।
- সাদাফুল শুধুমাত্র রাত্রিতে ফোটে।
- গুণমান সম্পন্ন আম মুর্শিদাবাদে হয়।

ভালো কথা

রবীন্দ্রজয়ন্তী

বাবা সেদিন খালিহাতে বাজার থেকে ফিরে এসে মায়ের কাছে ব্যাগ চাইলেন। বাজারের দোকানদার-কাকুরা নাকি বাড়ি থেকে ব্যাগ না নিয়ে গেলে আলু পটোল কিছুই দেবে না। এমনকী মাছ-কাকুরা মাছও দেবে না। বাজারের সবাই ঠিক করেছে তারা আর প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ দেবে না। ক্যারিব্যাগের কারণে নাকি ড্রেন বন্ধ হয়ে বর্ষায় বাজার ডুবে যায়। তখন সবার কষ্ট হয়। তাছাড়া বেশিরভাগ বাড়ি থেকে ক্যারিব্যাগে করে আবর্জনা ফেলে রাস্তা নোংরা করেদেয়। আমার মামাতো দাদা ইন্দোরে থাকে। ও সেবার বেড়াতে এসে বলেছিল তোদের কলকাতা খুব নোংরা। সেদিন আমার খুব খারাপ লেগেছিল। দোকানদার-কাকুদের এই সিদ্ধান্তে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

দেবাংশু আচার্য, সপ্তম শ্রেণী, করুণাময়ী, কলকাতা-১০৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ব তু ন ষা মা	(১) ণী ধা র রা ব বি
(২) তি দা রা ন খ	(২) ন লী ক্ষ ণ্ড ত্র ম

৭ মে সংখ্যার উত্তর

(১) হিমালয়দুহিতা (২) স্বদেশহিতৈষণা

৭ মে সংখ্যার উত্তর

(১) সর্বান্তকরণে (২) সর্বজনশ্রদ্ধেয়

উত্তরদাতার নাম

(১) আলাপন দলই, হলদিয়া, পূঃ মেদিনীপুর। (২) রূপষা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯। (৩) সোহম সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া। (৪) দেবরাজ মহাপাত্র, বিক্রমপুর, বাঁকুড়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ১২

শেষপর্যন্ত যুধিষ্ঠির তরুণ অভিমন্যুকে সব দায়িত্ব দিলেন।

আসন্ন বিশ্বকাপে ফেভারিট ব্রাজিল এবং স্পেন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বকাপ ২০১৮ নিয়ে কোনওরকম ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে যাওয়াটা মূর্খামির নামান্তর। কারণ এই মুহূর্তে তিনটি দেশ শক্তি ও ভারসাম্যের বিচারে তুল্যমূল্য। ব্রাজিল, স্পেন এবার তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে এক চমৎকার দল নিয়ে রাশিয়ায় এসেছে। আর জার্মানি, ফ্রান্সকেও হেলাফেলা করা যাবে না। একই কথা প্রযোজ্য আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রেও। তবে এই তিন দেশের অধিকাংশ তারকা ফুটবলার নিজের দেশে লিগ ও অন্যান্য টুর্নামেন্ট খেলে কতটা জাতীয় দলের সঙ্গে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে তরতাজা অবস্থায় নামতে পারবে তা নিয়ে এক প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। যেমন আর্জেন্টিনার মেসি, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া বা ফ্রান্সের আঁতোয়া গ্রিজম্যান, পল পোগবারা টানা ৭/৮ মাস স্পেন, ফ্রান্সের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লিগ ও সুপার কাপের মতো টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে সেরকম বিশ্রামের অবকাশ পায়নি। আর জাতীয় দলের ট্রেনিং ক্যাম্পে সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে বেশিদিন না থাকায় বোঝাপড়া গড়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা হতে পারে।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে ব্রাজিলের ২/৪ জন সুপারস্টার ছাড়া বাদবাকি সব ফুটবলারই নিজের দেশে খেলায় টিম কম্বিনেশন তৈরি করতে সেরকম সমস্যা হবে না টিমের কোচ ও সাপোর্ট স্টাফের। অন্যদিকে স্পেনের অধিকাংশ তারকা ফুটবলার লা-লিগায় খেলেন। ফলে স্পেনের জাতীয় দল ও প্রধান ক্লাব দলগুলির মধ্যে একটা সুসংহত ভারসাম্যের বিন্যাস দেখা যায়। আর বার্সেলনা, রিয়াল মাদ্রিদ, অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের খেলার স্টাইল আর স্পেনের জাতীয় দলের স্ট্র্যাটেজি, ট্যাকটিক্সের মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই। সর্বোপরি ব্যক্তিগত দক্ষতা ও প্রতিভার নিরিখে ব্রাজিলের ধারেকাছে কেউ

আসছে না। স্পেনেও বেশ কিছু অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন ফুটবলার উঠে এসেছে মাঝের চার বছরে। তাই জাভি, ফার্নান্দো তোরেস, দাভিদভিয়ারা সরে যাওয়াতেও তেমন কোনও ফাঁকফোকর তৈরি হয়নি স্পেন দলে আলাভারো মোরাতা, ইস্কো, জর্ভি আলবাকে নিয়ে অবশ্যই স্বপ্ন দেখা যায়। ইনিয়েস্তা, বুসকেতস, পিকে, সেগিও র‍্যামোসের মতো অভিজ্ঞ এবং অতি পরিশীলিত ফুটবলারদের সঙ্গে মোরাতা, ইস্কো, আলবার মতো ছটফটে ব্রিলিয়ান্ট স্কিলফুল ফুটবলারের তালমিল যদি ঠিক থাকে তবে স্পেন যে কোনও বড় শক্তিকে উপড়ে দিতে পারে।

ব্রাজিল সেই ২০০২ সালে শেষবার বিশ্বকাপ জিতেছে। এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশিবার বিশ্বকাপ ও সুপার বিশ্বকাপ অর্থাৎ কনফেডারেশন কাপ জয়ের নজির সৃষ্টিকারী দল। দীর্ঘ ১৬ বছরের বিশ্বকাপ খরা কাটাতে মরীয়া ব্রাজিল দল। বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ও উৎকর্ষের চরমতম বিন্দুর বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় সেলেকাওদের (ব্রাজিল দলকে এই নামে ডাকা হয়) জোগো বোনিতোর (নান্দনিক অথচ ভয়ঙ্কর তীব্রতা) মাধ্যমে। ব্রাজিলের ফুটবল মানে এক স্বর্গীয় সুষমা মহা কাব্যিক আবেদন। যদিও এখন অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে সেই সুষমা, শিল্প-নন্দন। তবুও একটা নেইমার, একটা গ্যাব্রিয়েল জেসুস, একটা কুটিনহো যখন আছেন সেই জোগো বোনিতোর খানিকটা ঝলক অবশ্যই দেখতে পাওয়া যাবে।

মেসি, রোনাল্ডো অন্য গ্রহের ফুটবলার হতে পারেন, কিন্তু তাদের দলে উপযুক্ত সঙ্গত করার মতো ফুটবলার খুব একটা নেই। মেসির পাশে তবু প্লে-মেকার ডি মারিয়া আছেন, অভিজ্ঞ জিওয়েন আছেন। রোনাল্ডোর সঙ্গে সেরকম যুগলবন্দি তৈরি করার মতো কেই বা আছে পর্তুগাল দলে। যদিও দুবছর আগে অতি শক্তিশালী ফ্রান্সকে হারিয়ে ইউরো কাপ জিতেছে পর্তুগাল। কিন্তু এই বিশ্বকাপে তাদের কেউ ফেভারিট তকমা দিতে রাজি নয়। আর্জেন্টিনা দক্ষিণ আমেরিকা চ্যাম্পিয়নশিপে রানার আপ হয়েছে। মেসি একটা বিশ্বকাপ জিততে সর্বশক্তি দিয়ে খেলবেন। যদি ডি মারিয়ারা চোট আঘাত কাটিয়ে স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেন তবে কিন্তু মিরাকল হতে পারে। আর গ্রিজম্যানের ফ্রান্স অতি মানবিক কিছু করে ফেলতে পারে।

গত ইউরো কাপে ফাইনালে হারটা এখনো ভুলতে পারেননি কোচ দিদিয়ের দেশ। তার সময়ে ফ্রান্স বিশ্বকাপ, ইউরো কাপ, কনফেডারেশন কাপ— বিশ্বের সবকটি বড় টুর্নামেন্ট জিতেছে ফরাসিরা। কোচ হয়ে সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি যদি করে দেখাতে পারেন তবে ফিফার হল-অব-ফেমে চিরস্থায়ী আসন পেয়ে যাবেন তিনি। তাঁর দলে আছেন বেশ কিছু জিনিয়াস ফুটবলার। গ্রিজম্যান, বেঞ্জিমা জিরুর, পোগবা, দেম্বেলে প্রত্যেকে ইউরোপে ক্লাব ফুটবলে বড় বড় নাম। আক্রমণ ও রক্ষণে রয়েছে সুষম ভারসাম্য। ফ্রান্স বিশ্বসেরা হোক, মনে প্রাণে চাইছেন স্বয়ং ফিফা প্রেসিডেন্ট গিয়ানি ইনফ্যানটিনো পর্যন্ত। ■

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯

Regd. NGO NITI AAYOG, Govt. of India, New Delhi • Govt. Regd. W.B.

ফোন ঃ 9830597884, 9073402682, (033) 2463-7213

প্রতিষ্ঠাতা ঃ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

৩৯তম বর্ষের কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স ইন্ অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এণ্ড রাজযোগ

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ,অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এণ্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইণ্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজের (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারওপ্যাথি,রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাক্টিস, [স্ট্রেস(Stress) ম্যানেজমেন্ট], যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ্ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক জিম (পাওয়ার যোগা), যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বৎসর, প্রতি রবিবার ১ টা থেকে ৪ টে পর্যন্ত

যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ

আরম্ভ ঃ ২৪শে জুন ২০১৮

কোর্স ফি ঃ ৮০০০ টাকা, এককালীন ৬০০০ টাকা, ফর্ম ও প্রস্পেক্টাস ১০০ টাকা, ডাকযোগ ১২০ টাকা

ভর্তি চলছে

সন্ত্রাসবাদের উৎসমূলে আঘাত করতে প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস

সন্তোষ দেবনাথ

বহুদর্শী এবং অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনেতা ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এককালে যে মন্তব্য করেছিলেন তা যে কতটা অভ্রান্ত এবং বাস্তব চিন্তাপ্রসূত তা আজ শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। তার অভূতপূর্ব বিশ্লেষণী ক্ষমতার সেই মন্তব্য ঘিরে আজ বিশ্বজুড়ে চর্চা চলছে। তিনি সখেদে বলেছিলেন, 'All the criminals are Muslim' অর্থাৎ সব অপরাধীই মুসলমান। আমরা ভারতবাসী আজ তার চরম ভুক্তভোগী। বলা হয়ে থাকে ইসলাম শান্তির ধর্ম। কিন্তু অন্য সব ধর্মের এমনকী নিজ ধর্মের বিরুদ্ধ মতের অনুসারী হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করে এ কোন শান্তির ধর্মের কথা বলা হচ্ছে। সর্বধর্মের সমন্বয় হলো 'যত মত তত পথ', যে কথা বলে গেছেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বিভিন্ন নদনদী যেমন বহু পথ পার হয়ে সাগর মহাসাগরে মিলিত হয় এবং সেটিই তাদের ইপ্সিত প্রাপ্তি, ঠিক তেমনই বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের মত ও ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছয়। ধর্ম হলো মানুষের মনের বিশ্বাস, বহিরঙ্গে তার ছাপ পড়বে কেন! বিশ্বের অন্য সব ধর্ম সেই মত ও পথের মান্যতা দিলেও ইসলাম তার ব্যতিক্রমী পথ নিয়ে চলতে অভ্যস্ত। ইসলামের বিস্তার শুরু হয়েছিল আজ থেকে হাজার বছরেরও বেশি আগে। তারা আরব মুলুক পার হয়ে একে একে প্রায় সমস্ত মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশ পদানত করে ধাবিত হয়েছিল ইউরোপ ও ভারত ভূমিতে। আগ্রাসন এখনও থামেনি। বরং তা এখন আরও প্রসারিত। তারা আজ ইসলামের নামে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছে। প্রায় সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা দেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছেন ইসলামি মৌলবাদ কী ভয়ঙ্কর বস্তু। ধ্বংস ও হত্যার মধ্য দিয়ে আজ তারা সমগ্র বিশ্বে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক অলীক খেলায় মেতে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আরও কিছু আলোচনার পূর্বে আমাদের দৃষ্টি ফেরানো যাক ভারতের দিকে।

ভারতে মুসলমান অভিযান শুরু হয়েছিল অষ্টম শতকে। তারপর ভারতের রাজা-মহারাজাদের অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারতের মুসলমান শাসন শুরু হয়। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ চৌহানকে উচিত শাস্তি দেওয়ার জন্য কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র মধ্য এশিয়া থেকে মহম্মদ ঘোরিকে ডেকে আনেন। সম্মুখ সমরে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হন। মহম্মদ ঘোরি দিল্লি দখল করে দেশে ফিরে গেলেন, কিন্তু রেখে গেলেন তার প্রতিনিধি কুতুবুদ্দিন আইবককে। শুরু হলো ভারতে মুসলমান শাসন। সেই থেকে দিল্লিতে প্রায় ৭০০ বছর ইসলামি শাসন চলে। শেষ হয় ভারতে ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পর। দু-একজন ব্যতিক্রমী সুলতান ও সম্রাট ছাড়া প্রায় সব মুসলমান শাসক হিন্দু ও শিখদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। ওই সময় ব্যাপকহারে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হয় এবং হিন্দু নারীদের অপহরণ করা হয়। বর্তমান ভারতেও চলছে সেই ট্রাডিশন।

দিল্লির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই চলে মুসলমানদের বঙ্গদেশ অভিযান। কুতুবের সেনাপতি বখতিয়ার খলজি রাজা লক্ষ্মণ সেনের হাত থেকে বঙ্গদেশ দখল করে। সেই থেকে বঙ্গে মুসলমান শাসন চলে ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত। তারপর ইংরেজরা দখল করে বঙ্গদেশ। শুরু থেকে সুদীর্ঘ সময় ধরে ভারতের অন্য অংশের মতো বঙ্গে মুসলমান শাসকরা একই নীতি অনুসরণ করেছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভাবা হয়েছিল অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু তা যে ঘটেনি তার প্রমাণ স্বাধীনোত্তর যুগে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব-পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে বিতাড়ন এবং তাদের সম্পত্তি দখল করে, তাদের নির্বিচারে হত্যা করে এবং হিন্দু মেয়েদের জোর করে ধর্মান্তরিত করে। বর্তমান বাংলাদেশেও হিন্দুদের অবস্থার বিশেষ কিছু হেরফের হয়নি। অত্যাচার, সম্পত্তি দখল, ধর্মান্তরকরণ এবং সেই সঙ্গে চলছে মন্দির ধ্বংস ও পুরোহিত হত্যা। মৌলবাদীদের অত্যাচারের হাত থেকে বাদ যাচ্ছে না বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের মানুষও।

বিশ্বের যে সমস্ত দেশ মুসলমান প্রধান সেসব দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। সেইসব দেশ অন্য ধর্মের মানুষদের কাছেও নিরাপদ নয়। বিশ্বে মুসলমান দেশের সংখ্যা অন্তত ৫০টির কম নয়।

হিন্দুরাষ্ট্র বলে এখন বিশ্বে আর কোনও দেশ নেই। একমাত্র ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্র নেপাল তাও এখন আর হিন্দু রাষ্ট্র নয়। দ্বিজাতি অর্থাৎ মুসলমানদের জাতিসত্তা আলাদার ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয় মুসলমান দেশ পাকিস্তানের আর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতে সব ধর্মের মানুষের

ফঃ ৬

সমানাধিকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের আরও একাধিক রাজ্যে এই নীতি অনুসৃত না হয়ে চলছে ভোটের নামে মুসলমান তোষণ। তার ফলে প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে চলছে অবাধে মুসলমান অনুপ্রবেশ।

পশ্চিমবঙ্গ ইসলামি সন্ত্রাসবাদী ও জঙ্গিদের কাছে স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত। সরকারি নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্যে ইসলামি মৌলবাদীরা এ রাজ্যকে নিরাপদ মনে করে। বাংলাদেশ এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইসলামি জঙ্গিরা এ রাজ্যে আস্তানা গেড়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার নীরব। কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় মধ্যে মধ্যে ২/১ জন সন্ত্রাসবাদী এখানে ধরা পড়ে, কিন্তু অধরা থাকে অনেক। সন্ত্রাসবাদীরা পশ্চিবঙ্গকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে তার জাল সারা ভারতে বিস্তার করছে। কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে সরকারের জোর তৎপরতা কোথায়! এসব বিষয় নিয়ে কিন্তু ভাববার সময় এসেছে। না হলে আরও অনেক খাগড়াগড় তৈরি হবে। এখন আবার শুরু হয়েছে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া।

হিন্দুরা সর্বংসহা। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এদেশে মুসলমানদের প্রতি কোনও অবিচার হয় না। পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের কোথাও মুসলমান নির্যাতন হলে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা মাত্রাতিরিক্ত সরব। কিন্তু উল্টে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে তারা আশ্চর্যজনক- ভাবে নীরব থাকেন। এর কোনওটিই কাম্য নয়। এটা কি দ্বিচারিতা নয়?

৯০-এর দশকের গোড়ায় কাশ্মীর থেকে যখন হিন্দু পণ্ডিতরা বিতাড়িত হয়ে নিজভূমে পরবাসী হলেন, তখন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা একটি কথাও বলেননি যেমন, ঠিক তেমনি মুসলমান অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও তারা সোচ্চার নন। কিন্তু মুসলমানদের উপর সামান্যতম অত্যাচার হলে, এমনকী মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী গ্রেপ্তার হলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ করেন এবং চোখের জলে বুক ভাসান। সম্প্রতি হাওড়া এবং আরও কয়েকটি জেলায় মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার করেছে ও করছে এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে তা নিয়ে কিন্তু রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা একেবারেই নীরব ও উদাসীন। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বাসিন্দা হিসেবে তাদের উচিত ছিল উভয় ব্যাপারে সরব ও সোচ্চার হওয়া।

ইসলামি সন্ত্রাসবাদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ইরাক। এই ইরাকে কয়েক বছর আগে জঙ্গিরা যে ৩৮ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল সে ব্যাপারে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু নীরব।

মুসলমানরা এখন বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছে। মুসলমান মৌলবাদীদের একমাত্র কাজ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ইসলামরাজ প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তারা মরিয়া। তাদের নিয়ন্ত্রণহীন জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে তারা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তৈরি করছে ভারতে, পাকিস্তানে, আফগানিস্তানে, ইরাকে, সিরিয়ায় এবং আরও অনেক দেশে।

এখন দেখা যাক কীভাবে তারা সন্ত্রাসবাদী তৈরি করে। সন্ত্রাসবাদীদের আঁতুড় ঘর রয়েছে ভারত-সহ বিশ্বের নানা দেশে। এইসব কেন্দ্রে মৌলবাদের প্রথম পাঠ দেওয়া হয়। ছোট ছোট বালক ও কিশোরদের ওইসব কেন্দ্রে ধরে এনে তাদের ধর্মের আফিম গেলানো হয় এবং তাদের শেখানো হয় একমাত্র ইসলাম বাদে অন্য সব ধর্মের মানুষ কাফের অর্থাৎ বিধর্মী এবং তাদের খতম করলেই খুলে যাবে বেহেস্তের দরজা। ইসলামে প্রতিবাদের কোনও জায়গা নেই। তারা ভাবে মোল্লা, মৌলবিদের কথা অভ্রান্ত। এইভাবে তৈরি হয় ক্ষুদে জঙ্গি এবং সন্ত্রাসবাদী এবং একদিন তারা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ও নির্বিচারে সভ্যতা ধ্বংস ও নরহত্যা চালিয়ে যায়। এরা সব আত্মঘাতী ঘাতক। এদের মধ্যে নারীবাহিনীও আছে। অন্যদের মেরে তারা নিজেদেরও বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়, এই বিশ্বাসে যে তাদের মেরে তারা বেহেস্তে যাচ্ছে। বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক উদার বুদ্ধিজীবী মুসলমান কিছুদিন আগে প্রশ্ন তুলেছিলেন, অন্য ধর্মের মানুষ হত্যা করে তারা যে বেহেস্তে যাবে এমন প্রমাণ কোথায়, কিন্তু মৌলবাদীদের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের কাছে তাঁরা পরাস্ত হন। তার প্রমাণ এই প্রতিবাদ এখন আর শোনা যায় না।

মুসলমান জঙ্গিরা সারা বিশ্বে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। আমেরিকা, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার অনেক দেশে তারা সন্ত্রাসের জাল বিস্তার করছে। যেহেতু তারা আত্মঘাতী তাই তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র দুটি উড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তারা যে ধ্বংস শুরু করেছিল আজও তা বন্ধ হয়নি, বরং বেড়েই চলেছে। ইসলামের ইতিহাস সৃষ্টির নয়। শুধু হত্যা ও ধ্বংসের। মধ্যযুগে তুর্কি মুসলমানরা বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে যে কদর্য কাজ করেছিল তার কোনও ক্ষমা হয় না। আর এইযুগে তালিবান এবং আই. এস. জঙ্গিরা আফগানিস্তানে বামিয়ান বুদ্ধমূর্তি আর সিরিয়ায় অইসলামিক স্থাপত্য ধ্বংস করে যে ইতিহাস মুছে দেওয়ার ঘৃণ্য কাজ করেছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা চিরকালের স্থায়ী কলঙ্ক। জঙ্গিরা বিশ্বব্যাপী ইসলাম কায়েম করতে চাইছে। কিন্তু তাদের প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী সম্মিলিত উদ্যোগ কোথায়? বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দেশে কিছু হয় মাত্র। জঙ্গিরা আত্মঘাতী একথা ঠিক। কিন্তু যদি তাদের উৎসমূলে আঘাত করা যায় তাদের অর্থের উৎস বন্ধ করা যায়। প্রয়োজন তাদের উৎখাতে সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের। তাহলে তারা পিছু হঠতে বাধ্য। শুধু আলোচনা, মত বিনিময় এবং একটির পর একটি সম্মেলনে কিছু হবে না। প্রয়োজন তার জন্য বিশ্বকে একতাবদ্ধ হওয়ার এবং মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের। আর ভারত তো জঙ্গি তৈরির সব থেকে বড় প্রসূতিগৃহ।

অনেক রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার জন্য জঙ্গিদের আশ্রয় এবং তাদের মদত দেওয়া হয়। বিষয়টি চরম উদ্বেগজনক। এর থেকে পরিত্রাণের খোঁজে ভারত-সহ সমগ্র বিশ্বকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ■

রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা বিস্ময়কর

গোপীনাথ দে

মায়ানমার সরকার রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে; তাই রোহিঙ্গারা মায়ানমার ত্যাগ করে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। রোহিঙ্গারা ভারতেও প্রবেশ করে আশ্রয় নিতে চেয়েছিল কিন্তু ভারত সরকার রাজি হয়নি। সেই কারণে ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাইরে ভারত সরকারের সমালোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। যদিও কিছু রোহিঙ্গা ঢুকে পড়েছে ভারতে। রোহিঙ্গাদের সংখ্যা প্রায় কুড়ি লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় ছয় লক্ষ কুড়ি হাজার বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে।

মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর অকথ্য অত্যাচার এবং অন্য দেশে আশ্রয় নেওয়া নিয়ে ভারতবর্ষের সংবাদমাধ্যমগুলি প্রায় প্রতিদিন শোরগোল ফেলে দিয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ পদক্ষেপ নিতে এবং মায়ানমার সরকারকে উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করাচ্ছে। এঘটনা আমরা সংবাদ মাধ্যমগুলির মাধ্যমে জানতে পারছি।

বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে হিন্দু শরণার্থী ভারতবর্ষে ঢুকেছে এবং এখনও ঢুকছে, তা নিয়ে আমরা নীরব এবং সেটার কোনও গুরুত্ব আমাদের মধ্যে নেই বা সংবাদমাধ্যমগুলির মধ্যে সেটাকে গুরুত্বই দেয় না। রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে আরম্ভকরে আমাদের সংবাদমাধ্যমগুলি সকলেই নীরব। বুদ্ধিজীবীরাও নীরব।

বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশন বলেছে আগামী ৩০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে। বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন হিন্দু শরণার্থী ভরতবর্ষে প্রবেশ করছে। আর এ ব্যাপারে আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যম, আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবী এবং আমরা সাধারণ মানুষ, সকলেই নীরব। আর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ব্যাপারটা তো বোধহয় জানেই না।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারকাতের 'বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি' শীর্ষক এক গবেষণায়। ওই গবেষণায়, দেখিয়েছেন ১৯৪৬ সাল থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে, পাঁচ দশকে মোট এককোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ ত্যাগকরতে বাধ্য হয়েছে।

এইসব ব্যাপারে ভারতবর্ষের সংবাদমাধ্যমগুলি একেবারে নীরব। রাষ্ট্রপুঞ্জও নীরব। উল্টে জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে; সহিষ্ণু হওয়ার উপদেশ দেয় এবং এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এখন যেটাকে আমরা কেরল প্রদেশ বলি তার মধ্যে মালাপুরম্ নামে একটি জেলা আছে; সেখানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন প্রচারককে পাঠানো হয়েছিল। সঙ্ঘের শাখা স্থাপনের জন্য। ওই জেলাটি মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ জেলা; খুব সামান্য সংখ্যক হিন্দু বসবাস করে। তাই সেখানে ওই প্রচারকের ঠাঁই হয় না। কোনওক্রমে এক হিন্দুর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই ওই বাড়ির একটি ছেলের বিবাহ হয়। ওই প্রচারক জানল বিবাহের পরের দিন ওই নবদম্পতি নববধুকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে যে মসজিদ আছে; সেই মসজিদের ইমামের কাছে নববধূকে রেখে আসতে হবে এবং সেখানে নববধূ সাতদিন থাকবে। সঙ্ঘের ওই প্রচারক বলে, না এটা হতে দেওয়া যায় না। বর বিবাহের পরদিন নববধূকে সোজা নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে এবং সেখানে অনুষ্ঠান হবে। তখন সকলেই বলে না-না তা হবে না— কারণ তাহলে দাঙ্গা লেগে যাবে। প্রচারক বলে দাঙ্গা লাগে লাগুক তবুও এটা হতে দেওয়া যায় না। এরপর প্রচারকের কথামতো কাজ হলে কিছু সমালোচনা হয়েছিল এবং বুদ্ধিজীবীরা বলেছিল এইবার বিভেদের রাজনীতি শুরু হয়েছে। আমরা কেমন মিলেমিশে এক সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করছিলাম আর এস এস এসে বিভেদের রাজনীতি শুরু করেছে। কিছুদিন হইচই হওয়ার পর প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যায়।

যখন কোনও আলোচনা চক্রে ভারতবর্ষ প্রসঙ্গ ওঠে তখন কোনও কোনও বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত বক্তারা বলেন ভারতবর্ষ প্রায় ২০০ বছর পরাধীন ছিল। আমি বলি, ভারতবর্ষ ২০০ বছর ইংরেজদের কাছে পরাধীন ছিল এবং তখন হিন্দু মুসলমান সকলেই পরাধীন ছিল ঠিকই। কিন্তু তার আগে প্রায় ৮০০ বছর মুসলমান শাসনকালে মুসলমানরা স্বাধীন ছিল কিন্তু হিন্দুরা পরাধীন ছিল। যার ফল স্বরূপ বলা যায় ওই ৮০০ বছরে ৩৩ হাজার মন্দির ধ্বংস হয়েছে। ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়েছে। মহম্মদ ঘোরি যখন ভারত আক্রমণ করে তখন ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬০ কোটি; কিন্তু যখন ইংরেজরা এল তখন হিন্দুর সংখ্যা হয়েছিল ২০ কোটি। অনেকে বলেন এসব তথ্য কোথায় পেলেন। আমি বলি ইতিহাস থেকে। কিন্তু আমরা যে ইতিহাস পড়ি, ব্রিটিশ সরকার তাদের ঐতিহাসিকদের দিয়ে লিখিয়েছিল। তাদের সুবিধার স্বার্থে। সেটাই আমরা আমাদের ইতিহাস বলে পাঠ করছি। এটা প্রকৃত ইতিহাস না প্রকৃত ইতিহাস এবার আমাদের শিখতে ও জানতে হবে।

হাজার বছর ধরে মুসলমান ও ইংরেজদের তাঁবেদারি করতে করতে আমাদের দেশের কিছু জনগোষ্ঠীর শরীরের জীবকোষের মধ্যে জিনগুলির চরিত্র বদলে গেছে। তাই এদের কাছে মুসলমান তোষণ করাটাই হলো প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা। তাই পৃথিবীর দুটি স্বাধীন দেশ, যে দুটি দেশ পূর্বে ভারতবর্ষের অংশ ছিল, সে দুটি দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হলেও তারা টুঁ শব্দটি করে না, অথচ রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য প্রায় কেঁদে ওঠে। ■

সাভারকর অর্থ স্বার্থত্যাগ : নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বীর সাভারকর ছিলেন একই সঙ্গে একজন অনুভূতিপ্রবণ কবি এবং আপসহীন বিপ্লবী। এই ভাষাতেই সাভারকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রেডিওতে তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে সাভারকরকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি মৃত্যুদিবসে জওহরলাল নেহরুকেও 'প্রণাম' জানান নরেন্দ্র মোদী। 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ৪৪ তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই মাসটি এলেই আমার সাভারকরের কথা মনে পড়ে। মে মাসের সঙ্গে সাভারকরের একটি যোগ রয়েছে। এই মাসটি সাভারকরের জন্ম মাস।'

সাভারকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে মোদী বলেন, 'মে মাসটি আরও একটি কারণে বিখ্যাত। ১৮৫৭ সালের মে মাসেই ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি প্রথম মহাবিপ্লব ঘোষণা করেছিল ভারতীয় জনগণ। ১৮৫৭ সালের ওই বিদ্রোহকে সাভারকরই প্রথম ঐতিহাসিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং লিখেছিলেন এটি নিছক একটি বিদ্রোহ নয়, এটি ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।' এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে লেখা সাভারকরের ওই গ্রন্থটিকে ব্রিটিশ সরকার ভারতে নিষিদ্ধ করে। তবে পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ মহলে সাভারকরের গ্রন্থটি বহুল প্রশংসিত হয়। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের ভিতরও সাভরকরের এই গ্রন্থটির অসম্ভব জনপ্রিয়তা ছিল। এই গ্রন্থটির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা অনেকেই ১৮৫৭ সালটিকে সিপাহি বিদ্রোহের বছর হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি। কিন্তু শুধু সিপাহি বিদ্রোহ বললে ওই মহাবিপ্লবকে ছোট করা হয়। ১৮৫৭ সালের ওই মহাবিপ্লবই ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম— যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন সাভারকর।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সাভারকর ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি একই সঙ্গে শাস্ত্র এবং শস্ত্রের আরাধনা করেছেন। আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় অটলবিহারী বাজপেয়ীজী সাভারকর সম্পর্কে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলেছিলেন, সাভারকর অর্থ ত্যাগ, সাভারকর অর্থ যুক্তি, সাভারকর অর্থ যৌবন, সাভারকর অর্থ প্রতিভা, সাভারকর অর্থ নিষ্ঠা। সাভারকর অর্থ তির, সাভারকর অর্থ তলোয়ার। এটাই যেন আমরা মনে রাখি।'

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং বিশ্ব যোগ দিবসের প্রসঙ্গও এসেছে। আগামী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পরিবেশের গুরুত্ব সবাইকে বুঝতে অনুরোধ করছি। আমরা এটুকু অন্তত প্রতিজ্ঞা তো করতে পারি পলিথিন এবং নিম্নমানের প্লাস্টিকের ব্যবহার আমরা বন্ধ করব। এই পলিথিন এবং নিম্নমানের প্লাস্টিক পরিবেশ, জীবজগৎ এবং আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবসের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যোগ এখন সমগ্র বিশ্বের একটি সমষ্টিগত সচেতনতা।' সংস্কৃত কবি ভর্তৃহরির কবিতা 'শতক প্রথম' উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যোগাভ্যাস সাহস বাড়ায়। মানসিক শান্তি বাড়ায়। ক্ষমাশীল করে তোলে মানুষকে। ভর্তৃহরি বলেছেন, প্রতিদিন যোগাভ্যাস করলে সত্য আমাদের সন্তান হয়ে ওঠে, ক্ষমা আমাদের ভগিনী হয়ে ওঠে, সংযম আমাদের ভ্রাতা হয়, ভূমি হয় আমাদের শয্যা আর জ্ঞান আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। একজন প্রকৃত যোগী সমস্তরকম ভয়কে জয় করেন। আমি তাই সকল দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাই, নিয়মিত যোগাভ্যাস করুন এবং সুখী, সমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল একটি জাতি নির্মাণ করতে সাহায্য করুন।'

প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রখ্যাত সাংবাদিক এম. জি. বৈদ্যকে ডি.লিট উপাধি

সংবাদদাতা॥ মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহরের মাখনলাল চতুর্বেদী রাষ্ট্রীয় পত্রকারিতা এবং সঞ্চার বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা প্রখ্যাত সাংবাদিক মাধবগোবিন্দ বৈদ্যকে ডি.লিট সম্মানে ভূষিত করল। গত ২৫ মে নাগপুরে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জগদীশ উপাসনে শ্রী বৈদ্যকে ডি.লিট উপাধিতে সম্মানিত করেন। মঞ্চে শ্রী বৈদ্যের সহধর্মিণীও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজসেবী বিরাগ পাচপোর, সাংবাদিক শ্রীকৃষ্ণ নাগপাল, নাগপুর নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধি এবং নাগপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিরোধীরা বিভেদ ছড়াচ্ছে : রাজনাথ সিংহ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের ভিতর মিথ্যা প্রচার করে তাদের আতঙ্কিত করে তুলতে চাইছে। নির্বাচন আরও যত এগিয়ে আসবে, বিরোধী দলগুলি এই কাজ আরও বেশি করে করবে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। রাজনাথ বলেছেন, রাজনৈতিক লড়াইটা ইস্যুর ভিত্তিতে হওয়া উচিত। আদর্শগত লড়াই হওয়া উচিত। কিন্তু পারস্পরিক ঘৃণা ছড়িয়ে বা বিভেদ সৃষ্টি করে তো রাজনৈতিক লড়াই হয় না। আমরা এ ধরনের ঘৃণা বা বিভেদ ছড়াই না। কিন্তু যারা এই ঘৃণা ও বিভেদ ছড়াচ্ছে— তাদের এটা বোঝা উচিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গরিব এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য আমরা একদম কিছু করিনি, একথা বিরোধীরা বলতে পারছে না। তাই তারা মিথ্যা রটনা করে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করতে চাইছে।

বর্তমান সরকারের শাসনকালে দলিত এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর অত্যাচারের কোনও অভিযোগ এলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রাজনাথ সিংহ বলেন— বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের ওপরই বিভিন্ন সময়ে হামলার ঘটনা ঘটে। হিন্দু, খ্রিস্টান, পার্শি, মুসলমান— নানা কারণে কিছু কিছু হামলার ঘটনা ঘটে এই সব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মানুষের ওপর। কিন্তু সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ওপরই হামলা করা হচ্ছে— এরকম কথা রটানো হয় কেন? আমরা কিন্তু কারও প্রতি বৈষম্য বা অবিচার করি না। বরং, আমরা প্রতিটি মানুষকে ন্যায়বিচার দেওয়ার চেষ্টা করি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি— কোথাও কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সরকার তাকে কখনই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। বরং, সেই ঘটনার সমাধানের চেষ্টা করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত একগুঁয়েমির জন্যই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হচ্ছে না— বিরোধীদের এই অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে রাজনাথ বলেন— কে বলছে আমরা একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে আছি। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য আমি তো সবপক্ষের সঙ্গেই বসতে রাজি আছি। কেউ যদি সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তিবোধ করে, তাহলে মধ্যস্থতাকারীর সহায়তাও নেওয়া যেতে পারে।

পাকিস্তানের প্রতি ভারত বরাবরই সৌহার্দ্যের বার্তা দিয়েছে বলেও রাজনাথ দাবি করেন। বলেন, অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন দিল্লি-লাহোর বাসযাত্রার সূচনা করেছিলেন। নিজেও লাহোর গিয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ব্যক্তিগত ভাবে সরাসরি নওয়াজ শরিফের কাছে গিয়েছিলেন। আমি নিজে পাকিস্তানে গিয়েছি। আর কী আমরা করতে পারি? পাকিস্তান কি আমাদের বার্তা বুঝতে পারে না? তৃতীয় কোনও রাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে রাজনাথ বলেন, পাকিস্তান যদি চায়, আমরা সরাসরিই কথা বলব। এ বিষয়ে তৃতীয় কোনও পক্ষের নাক গলানোর দরকার নেই।

রাজনাথ সিংহ বলেন, পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে জঙ্গিদের ঢোকানো বন্ধ করুক। ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়ে প্রকাশ্যে একটি বিবৃতি দিক। পাকিস্তান তো সবসময়ই বলছে, ওরা নাকি সন্ত্রাসবাদ আর অনুপ্রবেশে মদত দেয় না। সত্যিই যদি তাই হয়, তাহলে ওরা আমাদের সঙ্গে আসুক। যৌথভাবে আমরা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাই। পাকিস্তানের যদি সততা থাকে, তাহলে ওরা আমাদের সঙ্গে যৌথ অভিযানে আসুক। রমজান মাসে কাশ্মীরে সংঘর্ষ বিরতি প্রসঙ্গে রাজনাথ সিংহ বলেন, আমাদের কাশ্মীরি ভাই-বোনদের কথা ভেবেই রমজান মাসে আমরা সেখানে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করেছি। তার মানে এই নয় যে, পাকিস্তান সেখানে একের পর এক হামলা চালিয়ে যাবে। আসলে কাশ্মীরিদের প্রতি পাকিস্তানের কোনও সহানুভূতিই নেই। সহানুভূতি থাকলে রমজান মাসে আমাদের সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণাকে স্বাগত জানাতো পাকিস্তান। পাকিস্তানের চরিত্র এখন কাশ্মীরের মানুষ বুঝতে শিখেছে।

রাজনাথ সিংহ বলেন, কাশ্মীরের মানুষের প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। যারা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চাইবেন— তাদের সঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করব। কিন্তু যারা আক্রমণ করতে চাইবেন, তাদের পাল্টা মারেই আমরা জবাব দেব।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট

রাখাইনে রোহিঙ্গা তাণ্ডব, খুন ৯৯ হিন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া উচিত কিনা এই নিয়ে যখন সারা ভারতে বিতর্ক চলছে তখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি খবরে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। অ্যামনেস্টি লিখেছে, ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গা মুসলমানদের একটি দল মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের একটি হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামে ঢুকে নির্বিচার গণহত্যা চালায়। এই তাণ্ডবে নারী-পুরুষ-শিশু সব মিলিয়ে মোট ৯৯ জন হিন্দুর মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মায়ানমারে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে আসছে। সেই সমীক্ষারই ফলাফল তারা সম্প্রতি প্রকাশ করেছে।

বীণা বালা

রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, মায়নামারের মাংদ শহরতলির উত্তরাংশে আ নাউক খা মাউং মেইক গ্রামে বসবাসকারী হিন্দুদের আক্রমণ করে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির (এআরএসএ) জঙ্গিরা। ২০১৭ সালের ২৬ আগস্ট তারা ৬ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা এবং ৩টি শিশুকে হত্যা করে। ধীরে ধীরে আশপাশের গ্রামগুলিতে তাণ্ডব ছড়িয়ে পড়ে। রোহিঙ্গা আক্রমণ থেকে যাঁরা ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতাও প্রকাশিত হয়েছে ওয়েবসাইটে। তাদেরই মধ্যে একজন কোর মোরলা (২৫)। অ্যামনেস্টির প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, 'কালো পোশাক পরা একদল লোক আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল। আমি তাদের মুখ দেখিনি, শুধু চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছিলাম। ওদের হাতে বিরাট বড়ো বড়ো বন্দুক আর তলোয়ার ছিল। প্রথমে আমার স্বামীর গায়ে গুলি লাগে। তারপর আমার গায়ে।'

বীণা বালাও (২২) ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন। যে-আটজনকে বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে রাখা হয়েছে তিনি তাঁদের অন্যতম। বীণা বলেন, 'ওরা আমাদের বাড়িতে এল। ওদের মধ্যে কেউ কেউ কালো পোশাক পরেছিল, কেউ কেউ সাধারণ পোশাক। ওরা আমাদের গ্রামেরই লোক। আমার চিনতে কোনও ভুল হয়নি।' বীণার বক্তব্য অনুযায়ী, রোহিঙ্গা জঙ্গিরা সবার ফোন কেড়ে নিয়ে বাড়ির উঠোনে একজোট হয়ে দাঁড়াতে বলে। তাঁর নিজের ভাষায়, 'লোকগুলোর হাতে ছিল তলোয়ার আর লোহার রড। ওরা আমাদের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দিয়েছিল। চোখও বেঁধে দিয়েছিল। আমি জানতে চাইলাম, ওরা কী চায়? ওদের মধ্যে একজন বলল, তোমাদের ধর্ম আলাদা। তাই তোমরা এখানে থাকতে পারবে না। লোকটা রোহিঙ্গা ভাষায় কথা বলছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি কিছু আছে কিনা। আমি না বলাতে শুরু হলো মার। শেষ পর্যন্ত আমি সব দিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।'

রিকা ধর (২৪) আর একজন ভাগ্যবতী। তিনি বলেন, 'আমাদের পালাবার কোনও উপায় ছিল না। হাত চোখ সব বাঁধা ছিল।' রিপোর্ট বলা হয়েছে, 'হিন্দুদের চোখ বেঁধে দেবার পর তাদের গ্রামের বাইরে বের করে আনা হয়। তারপর নারী এবং শিশুদের কাছ থেকে পুরুষদের আলাদা করে দেওয়া হয়। মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হয় জঙ্গলে।' শুধু আ নাউক খা মাউং সেক গ্রামেই জঙ্গিরা ৫৩ জন হিন্দুকে গলা কেটে হত্যা করে। এদের মধ্যে ২০ জন পুরুষ, ১০ জন মহিলা এবং ২৩ জন শিশু। গ্রামের মাত্র ১৬ জন ইসলাম কবুল করে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির নির্বাচিত মুসলমান পাত্রদের বিয়ে করার শর্তে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়।

প্রাণ বেঁচে যাওয়া এই আটজন মহিলাই স্বীকার করেছেন গ্রামের সব পুরুষকে হত্যা করেছে রোহিঙ্গারা। এদের মধ্যে একজন বলেন, 'ওরা যখন ফিরে এল তখন ওদের তলোয়ার এবং হাত রক্তে মাখামাখি। শুনলাম ওরা আমাদের স্বামীদের এবং গ্রামের মোড়লকে খুন করেছে। সবাইকে গলা কেটে খুন করা হয়েছে। আমাদের বলল, পিছনে তাকিয়ো না। আমার বাবা, কাকা, ভাই, স্বামী— সবাইকে খুন করেছে ওরা। পুরুষদের মারার পর মেরেছে মেয়েদের।'

জঙ্গিরা পিছনে তাকাতে বারণ করলেও কেউ কেউ সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছিল। আউর নিকা এবং ফরমিলা এরকমই দু'জন। অ্যামনেস্টির প্রতিনিধিদের তারা বলেন, 'পিছন ফিরে দেখলাম চুলের মুঠি ধরে মাথাটা উঁচু করে ওরা আড়াই প্যাঁচে মেয়েদের গলা কাটছে।'

এই ঘটনাকে নারকীয় বললে কম বলা হয়। আজ অবধি বিশ্বের ইতিহাসে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যতগুলি নৃশংস ঘটনা ঘটেছে এটি সেই তালিকায় সম্ভবত প্রথম দিকে থাকবে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেবার ব্যাপারে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করা দরকার বলে মনে করছেন ভূরাজনীতির বিশেষজ্ঞরা।

একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল

পুস্তক প্রসঙ্গ

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

ধর্মের ভিত্তিতে ভারত রাষ্ট্র ভাগ হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমি পাকিস্তানের দাবিতে ভারত ভূমির একটি অংশ ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মুসলিম লিগ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে স্বাধীনতার প্রাক্-মুহূর্তে মুসলিম লিগের নৃশংস হিন্দু নিধনের সাক্ষী হয়ে রয়েছে কলকাতা এবং নোয়াখালি। লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারীর চোখের জল, জীবন, ধন মানের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছিল। দেশ ভাগ হওয়ার পরও অনেকটা নিরুপায় হয়েই হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাংশ থেকে গিয়েছিলেন তদানীন্তন মুসলমান রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে। এখন আছেন বর্তমানের বাংলাদেশে। কিন্তু কেমন আছেন তারা? কেমন করে দিন কাটছে তাদের? বাংলাদেশের সেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের করুণ দিনযাপনের ইতিহাসই লিপিবদ্ধ করেছেন কে.এন. মণ্ডল তাঁর 'বাংলাদেশী সংখ্যালঘুদের ভবিতব্য' গ্রন্থে। শ্রী মণ্ডল তাঁর শৈশব-কৈশোর এবং ছাত্রজীবন বাংলাদেশে কাটিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়ে ভারতে চলে এসেছেন। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কী ধরনের নির্যাতন হয়— তার সম্যক অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। এছাড়া নিয়মিত বাংলাদেশে যাতায়াতের ফলেও তিনি সেই দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। ফলে তাঁর গ্রন্থটি বাস্তব অভিজ্ঞতা, তথ্য এবং যথাযথ বিশ্লেষণের সংমিশ্রণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণা গ্রন্থের চেহারা লাভ করেছে।

বাংলাদেশে আদমশুমারিতে দেখা গিয়েছে, ১৯৭১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সেদেশে প্রায় ৬৩ লক্ষ হিন্দু হারিয়ে গিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই যেমন অত্যাচারের ভয়ে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তেমনই অনেককেই বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, বহু মানুষকে হত্যাও করা হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর ১৯৫১ সালের জনগণনায় দেখা যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল ২২ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পর ২০১১ সালে সেই সংখ্যা নেমে আসে মাত্র ৮ শতাংশে। এর একটি বড় কারণ, বাংলাদেশ স্বাধীনতার যুদ্ধে হিন্দুরা আত্মবলিদান দিলেও, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের কয়েকবছর পর থেকেই পাকিস্তান আমলের মতোই হিন্দুদের ওপর অত্যাচার নেমে আসতে থাকে। যত দিন গিয়েছে, সেই অত্যাচারের মাত্রাও তত বেড়েছে। বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদ এবং জঙ্গি জেহাদি কার্যকলাপের বাড়বাড়ন্তই

যে ওই দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে ক্রমশ বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে— শ্রী মণ্ডলের গ্রন্থে নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সম্ভারেই তা প্রমাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এই করুণ অবস্থার কথা বোঝাতে গিয়ে শ্রী মণ্ডল ইতিহাসেরও আশ্রয় নিয়েছেন। দেশভাগ পর্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেমন— মুসলিম লিগের উত্থান, ১৯৪৬ সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস এবং নোয়াখালির হিন্দু নিধন, দেশভাগ পর্বের দাঙ্গা, মুসলিম লিগের পাকিস্তান রাষ্ট্র আদায়—সবই তথ্য সহযোগে উপস্থাপন করেছেন লেখক। দেশভাগ পর্বের এই ইতিহাসটি পাঠক অবহিত হওয়ার ফলে, বর্তমান বাংলাদেশে কেন ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন— তা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। ইতিহাসের এই অংশটি তাঁর গ্রন্থে তুলে দিয়ে শ্রী মণ্ডল আর একটি উপকারও করেছেন। দেশভাগ পর্বের এই ইতিহাসটিকে এবং হিন্দুদের অত্যাচারিত হওয়ার বিষয়টিকে ভারতের সেকুলার বামপন্থী এবং নেহরুপন্থী ঐতিহাসিকরা এড়িয়ে যান। যার ফলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রকৃত ইতিহাস অনেকটাই অজানা থেকে গেছে। এই গ্রন্থটি পরবর্তী প্রজন্মকে সেই ইতিহাস চিনে নিতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশের অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত বাঙালি হিন্দুরা বরাবরই আশ্রয় এবং সহানুভূতির জন্য ভারতের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু ভারতের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ কখনও বাংলাদেশের এই অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত হিন্দুদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। এরা প্যালেস্তাইন নিয়ে চোখের জল ফেলেছে। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু নিধনের প্রতিবাদ করেনি। এই স্বার্থসর্বস্ব ধান্দাবাজ বুদ্ধিজীবী সমাজের সামনেও চ্যালেঞ্জ শ্রী মণ্ডলের গ্রন্থখানি।

গ্রন্থখানি আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে, পশ্চিমবঙ্গেও ক্রমশ মুসলিম মৌলবাদি এবং জেহাদিদের তাণ্ডব বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই হিন্দুরা ক্রমশ সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে এই গ্রন্থটি এপার বাংলার হিন্দুদেরও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক করবে। পশ্চিমবঙ্গও ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলাদেশ হবে কিনা সে ভাবনা তাদের ভাবাবে।

কে এন মণ্ডলের এই প্রয়াস প্রশংসনীয়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশে ক্রমাগত মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি দলিল এই গ্রন্থটি। অবশ্যপাঠ্য এই গ্রন্থটি সমগ্র হিন্দু সমাজকে ভাবাবে— এই আশা রাখি।

বাংলাদেশী সংখ্যালঘুদের ভবিতব্য— কে. এন. মণ্ডল।। প্রকাশক : ক্যাম্প, ২ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।। দাম : ২০০ টাকা।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

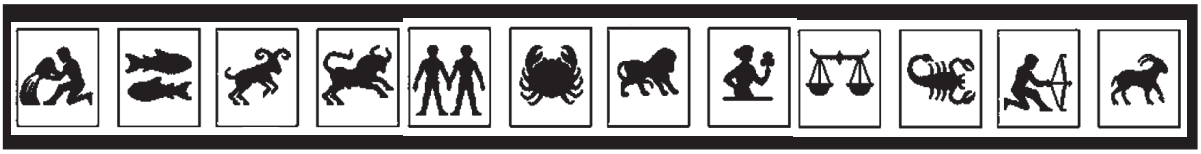

৪ জুন (সোমবার) থেকে ১০ জুন (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে বৃষে রবি-বুধ, মিথুনে শুক্র, কর্কটে রাহু, তুলায় বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে মঙ্গল এবং কেতু। শনিবার রাত্রি ২-৩০ মিনিটে শুক্রের কর্কটে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র তুলায় বিশাখা থেকে মকরে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে।

মেষ : কর্মক্ষেত্রে নিজ দক্ষতা ও নিষ্ঠায় পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ। সংস্কৃতি-শিল্পানুরাগীদের সৃজনশীলতায় স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ।
ভ্রাতা-ভগ্নী-প্রতিবেশী ও অধস্তন কর্মীর বিরোধিতায় তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

বৃষ : বিদ্যার্থী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক, আইনজ্ঞ, বিচারক, আই টি সেক্টরে কর্মরতদের অনুকূল পরিবেশ এবং সর্বাঙ্গীণ ইতিবাচক ফল। সপ্তাহের মধ্যভাগে পুলিশ, মিলিটারি, ক্রীড়াবিদ এবং সরকারি কর্মচারীদের প্রতিযোগিতায় সাফল্য ও পদোন্নতি।

মিথুন : ভ্রাতা-ভগ্নীর অর্থলাভের যোগ। প্রেম-প্রীতি- ভালোবাসায় দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত ইতিবাচক ফল। গৃহে শুভ অনুষ্ঠান এবং পরিজন ও মিত্র সমাগম। সপ্তাহের অন্তভাগে জটিলতা, অস্বস্তি। নিকট ভ্রমণ।

কর্কট : পিতা-পুত্রের সুকৃতী, গুণীজনের সান্নিধ্যে সম্মান। পারিবারিক সম্পত্তি বিষয়ক জটিলতা হ্রাস। অন্তভাগে প্রতিযোগিতামূলক বিষয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজ প্রচেষ্টায় সাফল্য ও মানসিক শান্তি।

সিংহ : পড়াশোনায় চাপের কারণে শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি। ইলেক্ট্রনিক্স, সফ্‌টওয়ার কর্মী ও ব্যবসায়ীর ভাগ্যোদয় ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল। বিদ্যার্থী, মঠাধ্যক্ষ, প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের অনুকূল সময়। সন্তান-সন্ততির কর্মদক্ষতায় গর্ব ও আনন্দ। সপ্তাহের শেষ ভাগে পরিবারের সদস্যের স্বাস্থ্য ভালো না যাওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষত, বাত-বেদনা ও রক্তচাপ বৃদ্ধি।

কন্যা : পারিবারিক সুস্থিতি বজায় রাখুন। বিদ্যার্থীর লেখাপড়ায় অমনোযোগিতার সঙ্গে বিলাসী প্রবণতা বৃদ্ধি। অগ্রজের পদোন্নতি। লটারি, শেয়ার-ফাটকায় শুভ। স্ত্রী অর্থভাগ্যোন্নতির সহায়ক। উপার্জনের একাধিক পন্থার প্রসার।
জমি-বাড়ি-গাড়ি নেওয়ার ব্যাপারে কাগজপত্র ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে অগ্রসর হওয়া শুভ বুদ্ধির পরিচয়।

তুলা : শরীর-মন-বুদ্ধি জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টায় ছুটে বেড়াবে। শাণিত কথাবার্তা। লাইফ পার্টনারের সৌজন্যে অর্থাগমের ক্ষেত্র প্রশস্ত। পারিবারিক সুস্থিতি ও সন্তানের কৃতকর্মে সন্তুষ্টি। শিল্পী ও সৌন্দর্য্যের উপাসকদের সাবলীল পদচারণা।

বৃশ্চিক : মাতার স্বাস্থ্যোন্নতি ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির যোগ। সন্তানের চলাফেরায় নজর রাখুন। পতি-পত্নী উভয়েরই শরীরের যত্নের প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে নিজ প্রতিভার পূর্ণ মূল্যায়ন নাও পেতে পারেন। যুবশক্তির বিরোধিতা শান্ত ও সংযত ভাবে মোকাবিলা করুন।

ধনু : একাধিক উপায়ে আয়। পাবলিক রিলেশনে ব্যাস্ততা। উচ্চশিক্ষায় প্রবাস, গুণীজনের শুভেচ্ছা ও কাঙ্ক্ষিত ফললাভ। অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তা— সৃজনী ও মানবিক গুণের প্রকাশ। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে সক্রিয়তা।

মকর : আয়ের শ্লথ গতি। কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতার ঘাটতি না থাকলেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা হতাশার কারণ। সংস্থার আর্থিক লেন-দেনের দায়িত্ব কৌশলে এড়িয়ে চলুন। বিপরীত লিঙ্গের অশুভ দৃষ্টি ধেয়ে আসার প্রভূত সম্ভাবনা। লেখার কাজে যুক্তদের সার্বিক শুভ সময়। বাড়ি-গাড়ির যোগ শুভ।

কুম্ভ : প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও স্বজন বাৎসল্যে সম্পৃক্ত মন। বিরোধিতা ও শরীরের কারণে উদ্বেগ-অস্বস্তি। প্রমোটার-দালাল-মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি, বিলাস দ্রব্য ক্রয়, বকেয়া প্রাপ্তি। ভ্রমণ। অগ্রজ ও চাকুরেদের পদোন্নতির সম্ভাবনা।

মীন : সপ্তাহের প্রথম ও অন্তভাগে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিদ্যার্থী, প্রকাশকদের যুগ্মভাবে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপাবর্ষণ যোগ। জগতের কর্মযজ্ঞে নিজ প্রতিভার পূর্ণ বাস্তবায়ন ও মান্যতা। ভালো বন্ধু ভালো কাজের সহায়ক হবে। প্রীতিকর মেলবন্ধন, গৃহসুখ। গুরুজনের পরামর্শে অর্থাগমের ক্ষেত্র প্রশস্ত ও ত্বরান্বিত।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

শ্রী আচার্য্য